নভেম্বর ২০১৯ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৬

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ঋতুর রানি হেমন্ত

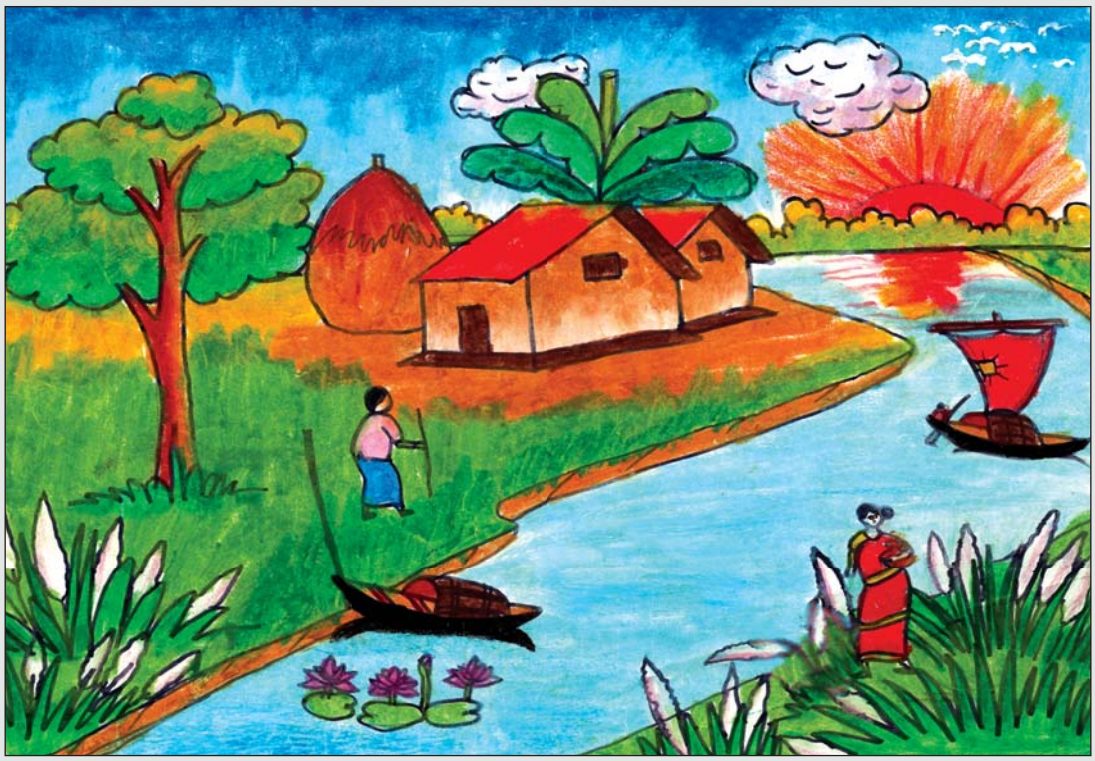

তাসফিয়া জামান তাসনিম, চতুর্থ শ্রেণি, পাবুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাপাসিয়া, গাজীপুর

সানজিদা আক্তার রুপা, পঞ্চম শ্রেণি, দক্ষিণ পূর্ব মাইট ভাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নভেম্বর ২০১৯ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৬

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

এবারের নবারুণ প্রচ্ছদ সেজেছে
বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এস.এম সুলতানের চিত্রকর্মে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, শরতের শুভ্রতা ছাপিয়ে শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে শান্ত-কোমল হেমন্ত। কার্তিক-অগ্রহায়ণ এ দুই মাস হেমন্তকাল। এই সময় চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে সজীবতার ছোঁয়া। প্রাণবন্ত আর কুয়াশায় জড়ানো হেমন্তের ভোর বিমুগ্ধ করে প্রতিটি মন। সবুজ ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির সূর্যের আলোয় মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করে। চারদিকে দেখা মিলে বিস্তৃত সোনালি ধানের মাঠ। যা হেমন্তের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও রূপ। কৃষকেরা নেমে পড়ে ধানের ক্ষেতে। এ সময় ঘরে ঘরে তৈরি হয় নতুন চালের পিঠা, ফিরনি-পায়েশ মজার সব খাবার। আবহমানকাল থেকে চলে আসছে বাঙালির এই ঐতিহ্য নবান্ন উৎসব।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা জানো রবিনসন ক্রুসো এক জনপ্রিয় উপন্যাস। এটি রচনা করেছেন ড্যানিয়েল ডিফো। ১৭১৯ সালে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ভেনেজুয়েলার কাছে একটি নির্জন দ্বীপে ২৮ বছর একাকী বাস করা একজন মানুষের আত্মজীবনী নিয়ে রচিত উপন্যাস রবিনসন ক্রুসো। এ বছর রবিনসন ক্রুসো ৩০০ বছরে পা দিল। রবিনসন ক্রুসোর দীর্ঘপথ পার করার গল্প নতুন করে আবার জানাচ্ছে নবারুণের এই সংখ্যাটি।

পড়ে জানিও কেমন হয়েছে, ভালো থেকো।

সূচি

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে

০৫ বিশ্বেজুড়ে মুজিব শতবর্ষ পালন/শাহানা আফরোজ

নিবন্ধ

০৪ ঋতুর রানি হেমন্ত
০৬ জাতীয় চার নেতা : বাংলাদেশের রাজনীতির উজ্জ্বল নক্ষত্র/ কাজী সালমা সুলতানা
০৮ কিশোর মুক্তিযোদ্ধা
লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির
২০ শিশু-কিশোরদের নাগালে সোস্যাল মিডিয়া
কী পাচ্ছি কী হারাচ্ছি/ড. মোহাম্মদ হাননান
২৬ ৩০০ বছর পূর্তি: রবিনসন ক্রুসো/শামস্ নূর
৩১ এ যুগের 'রবিনসন ক্রুসো'/শামীমা নাছরিন
৪৬ বিস্ময়কর নেট্রন হ্রদ/রায়হান সফিক
৫৩ বাংলাদেশের হুইল চেয়ার ক্রিকেট
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৫ জরুরি ফোন নাম্বার: মনে রাখো, সাহায্য নাও
মেজবাউল হক
৫৬ বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরামর্শ/জান্নাতে রোজী
৫৭ শিশুদের সকালের নাশতা/মো. জামাল উদ্দিন
৬০ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

বিজ্ঞান

৩৫ আকাশের সীমা ছাড়িয়ে/সানাউল্লাহ আল-মুবীন

ঐহিত্য

৪৩ বিশ্ব কারুশিল্প শহর সোনারগাঁ/আতিকুর রহমান

ভ্রমণ

৪৪ জলকাব্যের হাওর/হাছিনা বেগম

গল্প

১১ আজব বটে মিথ্যা নয়/আলম তালুকদার
১৫ রিমির আশ্চর্য পেনসিলবক্স ও ডিজিটাল দৈত্য
নিশাত সুলতানা
৩২ হলদে পাখির বাড়ি/ সুলতানা লাবু
৩৯ অংক নাকি অঙ্ক মংগল নাকি মঙ্গল/ তারিক মনজুর
৪১ পিঁপড়া ও অহংকারী হাতি/কৌশিক সূত্রধর
৫০ আমার দেখা একজন মুক্তিযোদ্ধার গল্প/তাজিয়া কবীর

কবিতা

০৩ সুফিয়া কামাল
২৪ গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন/ আমিরুল হক/
ফারুক হাসান
২৫ গোপেশচন্দ্র সূত্রধর/মো. তুহিন হোসেন/
মারিয়া আদনীন
৫৮ বাশার মাহফুজ/ কাজী সাইয়েদ আহমেদ

ছোটোদের লেখা

৪৮ চায়ের বাড়িতে যখন/সামিয়া হোসেন

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: তাসফিয়া জামান তাসনিম/ সানজিদা আক্তার রুপা
শেষ প্রচ্ছদ: লিলিয়ান ত্রিপুরা
০৪ শুভ সরকার
৩০ মাশরুর সাফির
৩৪ রিজওয়ান আল রাহাত (ইনান)
৪২ আমিরা তাবাস্‌সুম
৪৭ মু. আহনাফ সিদ্দিক
৫৯ মুবাশশির আহমেদ কাদির/ মাহির ওয়াইজ মিয়েল
৬২ সাদিয়া তাসনিম মোহনা/ জারিন তাসনিম জেবা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

হেমন্ত

সুফিয়া কামাল

সবুজ পাতার খামের ভেতর
হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে
কোন পাখারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে?

আনল ডেকে মটরশুঁটি,
খেসারি আর কলাই ফুলে

আনল ডেকে কুয়াশাকে
সাঁঝ সকালে নদীর কূলে।
সকাল বেলায় শিশির ভেজা
ঘাসের ওপর চলতে গিয়ে
হালকা মধুর শীতের ছোঁয়ায়
শরীর ওঠে শিরশিরিয়ে।
আরও এল সাথে সাথে
নুতন গাছের খেজুর রসে
লোভ দেখিয়ে মিষ্টি পিঠা
মিষ্টি রোদে খেতে বসে।
হেমন্ত তার শিশির ভেজা
আঁচল তলে শিউলি বোঁটায়
চুপে চুপে রং মাখাল
আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায়।

[সংকলিত]

ঋতুর রানি হেমন্ত

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে বারো মাসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতুর পালা বদল হয় প্রতি বছর! আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে বলা হয় ষড়ঋতুর দেশ। এই ঋতু পরিবর্তনের মধ্যে যেমন রয়েছে নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা, ঠিক তেমনি রয়েছে প্রতিটি ঋতুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য। ষড়ঋতুর অনন্য ঋতু হলো রূপের রাণি হেমন্তকাল!

স্নিগ্ধ হেমন্তকাল যেন আমাদেরকে একটু বেশিই বিমুগ্ধ করে। সকালে ধানগাছের ডগায় যে শিশির জমে থাকে তা হেমন্তের মায়াবী রূপের এক ঝলক সৌন্দর্যেরই প্রতিচ্ছবির জানান দেয়। সকালের প্রথম রোদের বর্ণচ্ছটায় গাছের পাতাগুলো যেন হেসে ওঠে। শরতের কাশফুল মাটিতে নুইয়ে পড়ার পর পরই হেমন্তের আগমন ঘটে। হেমন্ত নিয়ে আসে শীতের পূর্বাভাস। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে হেমন্তের এ শাশ্বত রূপ চিরকালীন।

'কার্তিক ও অগ্রহায়ণ'-এ দুই মাস হেমন্তকাল। এক সময় বাংলায় বছর শুরু হতো হেমন্ত দিয়ে। সম্রাট আকবর বাংলা পঞ্জিকা তৈরির সময় 'অগ্রহায়ণ' মাসকেই বছরের প্রথম মাস বা খাজনা আদায়ের মাস হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। 'অগ্র' এবং 'হায়ন' এ দুই অংশের অর্থ যথাক্রমে 'ধান' ও 'কাটার মৌসুম'। বর্ষার শেষ দিকে বোনা আমন-আউশ শরতে বেড়ে ওঠে। আর হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে পরিপক্ক হয় ধান। অগ্রহায়ণে ফসল ঘরে তোলা হয়।

বলা হয়ে থাকে, 'মরা' কার্তিকের পর আসে সার্বজনীন লৌকিক উৎসব 'নবান্ন'। হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই নবান্ন উৎসবের সূচনা। নবান্ন মানে নতুন অন্ন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী 'শস্যোৎসব'। নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে নতুন চালের ফিরনি-পায়েস অথবা ক্ষীর তৈরি করে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়।

নবান্নের উৎসবে ভাওয়াইয়া গানের সুর, বাউল গান, নাগরদোলা, শখের চুড়ি, খৈ, মোয়ার পসরা ইত্যাদি বসে গ্রাম্যমেলায়। ইদানীং বাংলার হেমন্তকাল, নবান্ন গ্রাম ছাড়িয়ে শহুরে রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর এখন শহরেও নবান্ন উৎসব হয়। ১৯৯৮ সন থেকে রাজধানী ঢাকা শহরেও আনুষ্ঠানিকভাবে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে। জাতীয় নবান্নোৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদ প্রতি বছর পহেলা অগ্রহায়ণ তারিখে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করে। নবান্ন হচ্ছে হেমন্তের প্রাণ। ■

শুভ সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণি, এসএম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

বিশ্বজুড়ে মুজিব শতবর্ষ পালন

শাহানা আফরোজ

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। গত ২৫ শে নভেম্বর সোমবার ইউনেস্কোর সদর দপ্তর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত পাস হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সঙ্গে ইউনেস্কো যুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন সম্পর্কে বিশ্ববাসীর জানার সুযোগ সৃষ্টি হলো।

গণভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৭শে নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় এক প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) আগামী বছর বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করবে। সভায় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জানান, প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে সংস্থাটির ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী বিশ্বের ১৯৫টি দেশে উদ্‌যাপন করা হবে। ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদের সভাপতি আলতে সেনজাইজার-এর সভাপতিত্বে এবং ইউনেস্কো মহাপরিচালক মিজ অদ্রে আজুলে, বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের চেয়ারপারসনদের উপস্থিতিতে এ সিদ্ধান্ত পাস হয়।

ইউনেস্কো শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে। ৫০ বছর বা এর গুণিতক যে-কোনো বার্ষিকী যদি ইউনেস্কোর কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে ঐ দিবস যৌথভাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই হিসেবে ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত মুজিববর্ষের বিশ্ব স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো। এর ফলে ইউনেস্কো বা এর ১৯৫ সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথ বা দ্বিপাক্ষিকভাবে এই দিবসটি পালন করতে পারবে বাংলাদেশ।

বছরব্যাপী অনুষ্ঠেয় 'মুজিববর্ষ'র জাতীয় অনুষ্ঠানমালার উদ্‌বোধন হবে আগামী ১৭ই মার্চ রাজধানীর জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ফ্লাইপাস্ট, ১০০ শিল্পীর অংশগ্রহণে যন্ত্রসংগীত, বাংলা ও ইংরেজিতে থিম সং পরিবেশন, ৫৫ মিনিটের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং লেজার শো। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুর ছোটো কন্যা শেখ রেহানার হাতে 'শ্রদ্ধা স্মারক' তুলে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। পরে প্রধানমন্ত্রী মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানমালার উদ্‌বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান বক্তৃতা করবেন।

আগামী ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের দিন গণনা শুরু হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিন গণনা বা ক্ষণ গণনা কর্মসূচির উদ্‌বোধন করবেন। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মগ্রহণের শততম বছর পূর্ণ হবে। ■

জাতীয় চার নেতা

বাংলাদেশের রাজনীতির উজ্জ্বল নক্ষত্র

কাজী সালমা সুলতানা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর প্রধান ষড়যন্ত্রকারী খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে তার মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে বলেন। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এই চার নেতা মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অস্বীকার করেন। এতে মোশতাক ক্ষমতা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে ২৩শে আগস্ট এই চার নেতাকে গ্রেফতার ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করে। নিজের ক্ষমতা নিষ্কন্টক করতে কারাগারের ভেতরেই ৩রা নভেম্বর তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। এই চার নেতা বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনসহ প্রতিটি সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই চার নেতাকে ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হয়ত সম্ভব না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য অপরিসীম ভূমিকা রাখেন তাঁরা।

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর। রাত দেড়টার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে একটি পিকআপ এসে থামে। পিকআপে কয়েকজন সেনাসদস্য বসা। সে সময়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার ছিলেন আমিনুর রহমান। কারা মহাপরিদর্শক টেলিফোন করে জেলারকে কারাগারে আসার নির্দেশ দেন। জেলার আমিনুর রহমান তাঁর কক্ষে ঢুকতেই টেলিফোন বেজে উঠে। টেলিফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি আইজি সাহেবের সাথে কথা বলবেন। আইজি সাহেব ফোনে কথা বলে জেলারকে জানালেন, প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আর্মি অফিসাররা যা চায়, সেটা তোমরা কর। সেনাসদস্যদের কাছ থেকে আওয়ামী লীগের তৎকালীন চার নেতাকে একত্রিত করার আদেশ আসে। কারা মহাপরিদর্শক একটি কাগজে চার নেতার নাম লিখে জেলারের হাতে দেন। এই চার নেতা হলেন- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান।

কারাগারের দুইটি কক্ষ থেকে তাদেরকে এক জায়গায় আনা হলো। কিন্তু চার নেতার কেউই জিজ্ঞেস করলেন না, তাদের কোথায় নেওয়া হচ্ছে। চারজনকে একত্রিত করতে কিছুটা সময় লাগে। এ কারণে সেনাসদস্যরা কারা কর্মকর্তাদের বিচ্ছিরি ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। চার নেতাকে একত্রিত করার পরই সেনাসদস্যরা গুলি করে তাঁদের হত্যা করে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম মহান মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন। মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পাকিস্তান কারগারে বন্দি ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। সেই সংকটময় সময়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন

করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৭ নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি গণপরিষদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের উপনেতা নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি হন।

তাজউদ্দীন আহমদ ১০ই এপ্রিল গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। মহান মুক্তিযুদ্ধকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগারে বন্দি অবস্থায় তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী তাজউদ্দীন আহমদ গণতন্ত্র ও বাঙালি জাতির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তাজউদ্দীন আহমদ প্রথমে অর্থ এবং পরে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি সংবিধান রচনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনকালে গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৬-দফা আন্দোলনের সময় দেশরক্ষা আইনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত মনসুর আলী ১৯৪৮ সালে যশোর ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণ নেন এবং পিএলজির ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় থেকেই তিনি ক্যাপ্টেন মনসুর নামে পরিচিত। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে পাবনা-১ আসনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল মাহমুদের বিরুদ্ধে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে আবদুল্লাহ আল মাহমুদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে মনসুর আলী পুনরায় পাবনা-১ আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছর তিনি আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি দলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করলে তিনি এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

জেলখানায় নিহত অপর জাতীয় নেতা এএইচএম কামারুজ্জামান। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬-দফার আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৭ সালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বিরোধীদলীয় উপনেতা নির্বাচিত হন। আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা দাবির সমর্থনে ১৯৬৯ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পুনরায় তিনি রাজশাহী থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে নির্বাচনে কামারুজ্জামান রাজশাহীর গোদাগাড়ি ও তানর- দুইটি আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা এই চার নেতাকে জেলের অভ্যন্তরে হত্যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করারই অংশ। জাতি পিতার আদর্শ সমুন্নত রেখে ষড়যন্ত্রকারীদের নীলনক্সা রুখে দিতে এই চার নেতা অতীতের মত জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে- এটাই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের ভয়। জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা এবং তারপর চার নেতাকে হত্যা প্রকৃতপক্ষে একই ষড়যন্ত্রের অংশ। একাত্তরে বিজয়ের উষালগ্নে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে বাঙালিকে মেধা শূন্য করার অপচেষ্টা হয়েছে। একই ভাবে সেই পাকিস্তানি প্রেতাত্মা খুনি মোশতাক ও তার দোসররা জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে দেশকে নেতৃত্ব শূন্য করার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সত্যের কাছে তাকে পরাজিত হতেই হয়। আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সরকার দেশ পরিচালনা করছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদানের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই উদ্যোগে সামিল হতে হবে সকলকে। সকল ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। ■

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ধারাবাহিক

কিশোর মুক্তিযোদ্ধা

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির

শহীদ শেখ মো. আবদুল্লাহিল বাকী বীরপ্রতীক

এক কিশোর বীরপ্রতীক মুক্তিযোদ্ধা শেখ মো. আবদুল্লাহিল বাকী। ১৯৫০ সালের ১৯শে জুন বুধবার তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার তেউটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে বাকী বিভিন্ন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করেন। সরিষাবাড়ি থেকে তিনি ম্যাট্রিক ও ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৭১ সালের শুরুতে সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য তিনি ঢাকা সেনানিবাসে আইএসএসবি পরীক্ষায় অংশ নেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিতে সেনানিবাস থেকে চলে আসেন। মার্চ মাসে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে বাকী বাংলাদেশ আত্মঘাতী সমিতি গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সেই সমিতির দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। একটি ছোটো দল নিয়ে তিনি ৮ই মার্চ ভূতপূর্ব লাট ভবনে ৩টি বোমা নিক্ষেপ করেন। তিনি যুদ্ধের সময় মিরপুরের গোপন একটি জায়গায় অনেক রাত পর্যন্ত নিজ হাতে বোমা বানিয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি নেন।

২৫শে মার্চের গণহত্যার পর বাকী সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য গোপনে বাড়ি থেকে বের হন। আরো ২০জন যুবকের সঙ্গে তিনি ১৮ই এপ্রিল ভারতে পাড়ি জমান। যাওয়ার আগে তিনি মায়ের জন্য একটি চিঠি লিখে রেখে যান।

প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে বাকী মে মাসে ঢাকার মতিঝিলের বেশ কয়েকটি জায়গায় পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। মুক্তিযুদ্ধকালে ১১৬ জন তরুণ যোদ্ধাকে নিয়ে সি-ইন-সি'র স্পেশাল টিম গঠন করা হয়। তাঁদেরকে আরবান গেরিলা হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়ায় উচ্চতর প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। বাকী প্রশিক্ষণ শেষে ২ নম্বর সেক্টরের আওতাভুক্ত হয়ে জুন মাসে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন।

বাকীর নামেই তার ইউনিটের নামকরণ করা

হয়েছিল 'বাকী ইউনিট'। এদের অপারেশনের জন্য ঢাকার তেজগাঁও, রমনা ও ঢাকা সেনানিবাস এলাকা নির্ধারণ করা ছিল। কঠিন অপারেশনগুলোতে বাকী নিজে নেতৃত্ব দিতেন। দক্ষতার সাথে একের পর এক আঘাত হেনে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে এক আতঙ্কে পরিণত হন।

গোপনীয়তার জন্য সেক্টর প্রদত্ত বাকীর কোড নাম ছিল 'নাদের'। বাকী তাঁর প্ল্যাটুন নিয়ে ঢাকার রূপগঞ্জ থানার বালু নদীতীরবর্তী নগরপাড়া গ্রামের আবদুল কাদেরের বাড়িতে ঘাঁটি স্থাপন করেন। মুক্তিকামী আবদুল কাদের তাঁর ৩টি ঘরের মধ্যে দুটি ঘরই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে থাকার জন্য ছেড়ে দেন। এখান থেকে বাকীর নেতৃত্বে এই গেরিলা দল ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে অপারেশন পরিচালনা করতেন।

বাকী অপারেশনের জন্য যেন সাধারণ মানুষের জানমালের কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। প্রতিটি অপারেশনের পূর্বে সহযোদ্ধাদেরকে নির্দেশনা দিতেন যেন সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি না হয়। বাকীর নেতৃত্বে অপারেশনগুলোর মধ্যে গুলবাগ পাওয়ার হাউজ আক্রমণ ও ধ্বংস, খিলগাঁও চৌরাস্তার নিকটবর্তী পাকিস্তানি সেনাছাউনিতে গ্রেনেড আক্রমণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে গ্রেনেড নিক্ষেপ (বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সময়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যাতে উপস্থিত না হয় সে জন্য এই কাজ করা হয়েছিল, এতে কোনো ছাত্রছাত্রী হতাহত হননি; বিবিসি, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র, আকাশবাণীতে এই আক্রমণের খবর প্রচারিত হয়) অন্যতম।

বালু নদীর পশ্চিম পাড়ে কায়েতপাড়ার প্রধান বাজারে প্রতিদিনই পাকিস্তানি সৈন্যরা টহল দিত। এই নদীতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন বাকী। ৩রা নভেম্বর ভোরে বাকী তাঁর প্ল্যাটুন নিয়ে নদীতীরবর্তী নয়ামাটি গ্রামে আসেন। তখন প্রায় সকাল ১১টা। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাজারে হাঁটাহাঁটি করছে। এ অবস্থায় গুলি করলে বাজারের সাধারণ মানুষের হতাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই মুক্তিযোদ্ধারা ঘন ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

বেলা ১২টার পরে ২০ জন পাকিস্তানি সৈন্য নৌকায় করে নদীর মাঝামাঝি চলে আসে। তখনই বাকীর নির্দেশে আক্রমণ করা হয়। নৌকা উলটে গিয়ে তারা ডুবে যায়। এই অপারেশনে ৯জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়।

এই সফল অপারেশনের পর এই ঘটনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে মর্টার ও মেশিনগানের সাহায্যে নগরপাড়া গ্রামে আক্রমণ চালায়। কিন্তু গ্রামে তখন কেউ ছিলেন না। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। বাকীর দূরদর্শিতার কারণে সেদিন নগরপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা গণহত্যার শিকার থেকে রক্ষা পায়।

৩রা ডিসেম্বর রাতে খিলগাঁওয়ে কালভার্টের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছিলো। এই টহল দলের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে খিলগাঁওয়ে সেনাবাহিনীর ঘাঁটি দখল করার পরিকল্পনা করেন বাকী। তাঁর উপ-অধিনায়ক মুক্তিযোদ্ধা এস এম আতিউর রহমান ও অন্যদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে মেরাদিয়া বাজারের কাছে অবস্থান নিতে নির্দেশ দেন। তিনি সহযোদ্ধা আমিরুস সালাম বাবুলকে নিয়ে বিকাল ৩টায় নিজ ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে পড়েন। রেকি শেষ করে মেরাদিয়া বাজারে প্ল্যাটুনের সঙ্গে যোগ দিয়ে একসঙ্গে আক্রমণের জন্য রওনা হন।

বাকীর পরনে ছিল প্যান্ট ও জ্যাকেট। তিনি জ্যাকেটের পকেটে দুটি গ্রেনেড রেখে পিস্তলটি বুটের মোজার সঙ্গে বাঁধলেন। ঠিক একই পোশাক ও হাতিয়ার ছিল বাবুলের। বাকী কোনোদিন আত্মসমর্পণ করবেন না বলে সব অপারেশনেই নিজের সঙ্গে গ্রেনেড রাখতেন। অপারেশনের আগে তিনি পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়িতে আসেন। বাবার সাথে দেখা করে রেকির সহযোদ্ধা বাবুলসহ খিলগাঁও চৌরাস্তার

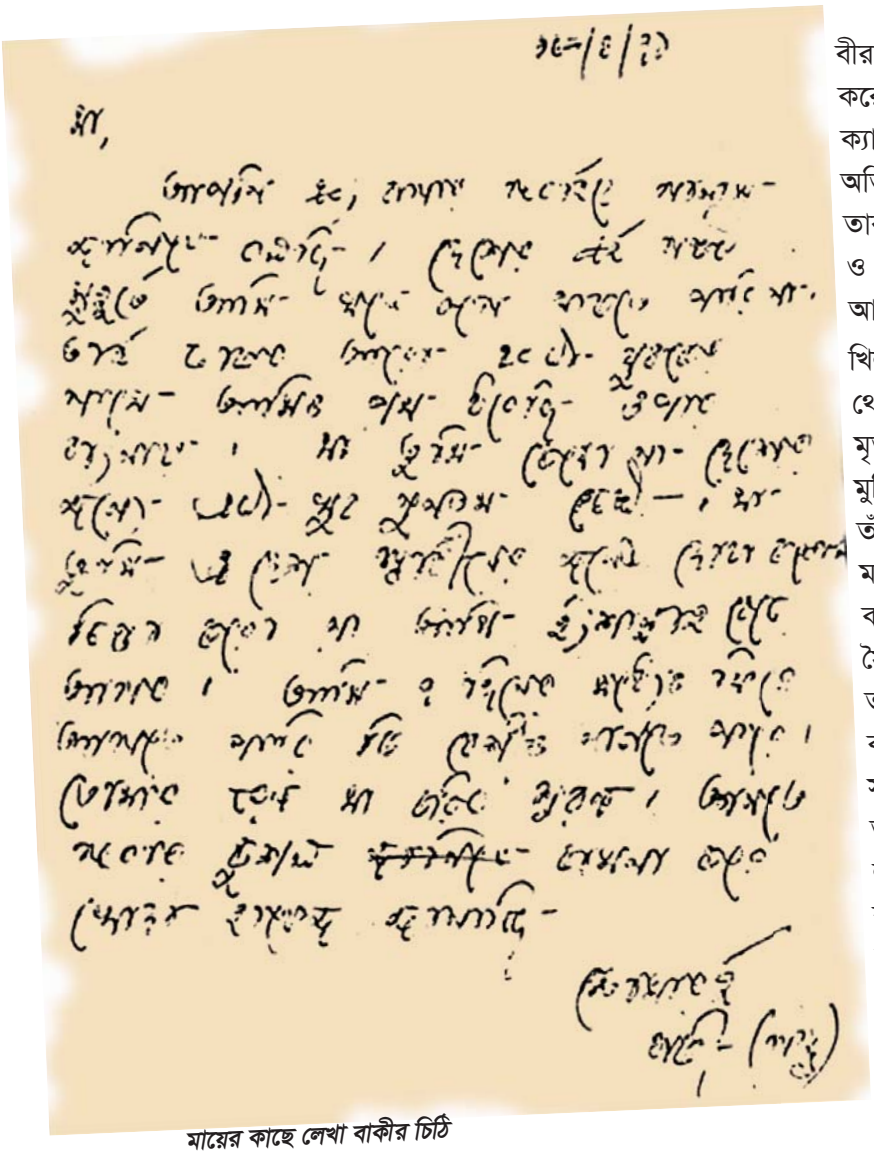

মায়ের কাছে লেখা বাকীর চিঠি

কাছে পৌঁছলে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁদেরকে ঘেরাও করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। বাকী ও বাবুল পাকিস্তানি সৈন্যদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন আর পিস্তল দিয়ে গুলি করতে থাকেন। এতে পাকিস্তানি সৈন্যদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হলেও তারা পালটা গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ক্রমাগত গুলি বর্ষণে বাকী ও বাবুল আহত হলে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁদেরকে ধরে ফেলে। মৃতপ্রায় মুক্তিযোদ্ধাদের উপর তারা উপর্যুপরি বেয়নেট চার্জ করে এই দুই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে। জানা যায়, পাকিস্তানি ক্যাপটেন কাইয়ুম এই অভিযানের নেতৃত্ব দেয়। তার নির্দেশেই আহত বাকী ও বাবুলকে বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করা হয়।

খিলগাঁওবাসীদের কাছ থেকে বাকী ও বাবুলের মৃত্যুর তথ্য পেয়ে দুজন মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিকের বেশে তাঁদের লাশ দেখতে যান। মর্গের পাশেই অবস্থান করছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা। মুক্তিযোদ্ধারা তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ইমাম সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে লাশগুলো গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরিয়ে আজিমপুর কবরস্থানে আনার অনুরোধ করেন। অধিনায়কের দাফনে শরিক হওয়ার জন্য সহযোদ্ধারা গোপনে আজিমপুর কবরস্থানে আসেন এবং সন্ধ্যায় সসম্মানে শহিদ বাকীর দাফন সম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনকারী এই বীরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরণোত্তর ‘বীরপ্রতীক’ খেতাবে ভূষিত করে।

(দি বাংলাদেশ গেজেট, এক্সট্রাঅর্ডিনারি, পাবলিশড্ বাই অথরিটি, শনিবার, ডিসেম্বর ১৫, ১৯৭৩, নোটিফিকেশন নম্বর ৮/২৫/ডি-আই/৭২-১৩৭৮-১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ক্রমিক নম্বর ৩২১)। ■

আজব বটে মিথ্যা নয়

আলম তালুকদার

এমন একটা দেশ ছিল, যে দেশের মানুষের আচার-আচরণ, কথা বলা, চলাফেরা একটু অন্য রকম ছিল। অন্য রকমটা আবার কী রকম? আমরা যেমন, ওরা তেমন ছিল না। দেশটা ঠিক কোথায় ছিল তা সঠিক বলতে পারব না। তবে দেশটা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেশ থাকলে মানুষ থাকবে গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়পর্বত, পশু-পাখি তো থাকবেই নাকি বলো? ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কোথায় ছিল? তারা আমাদের দেশের আশপাশেই ছিল।

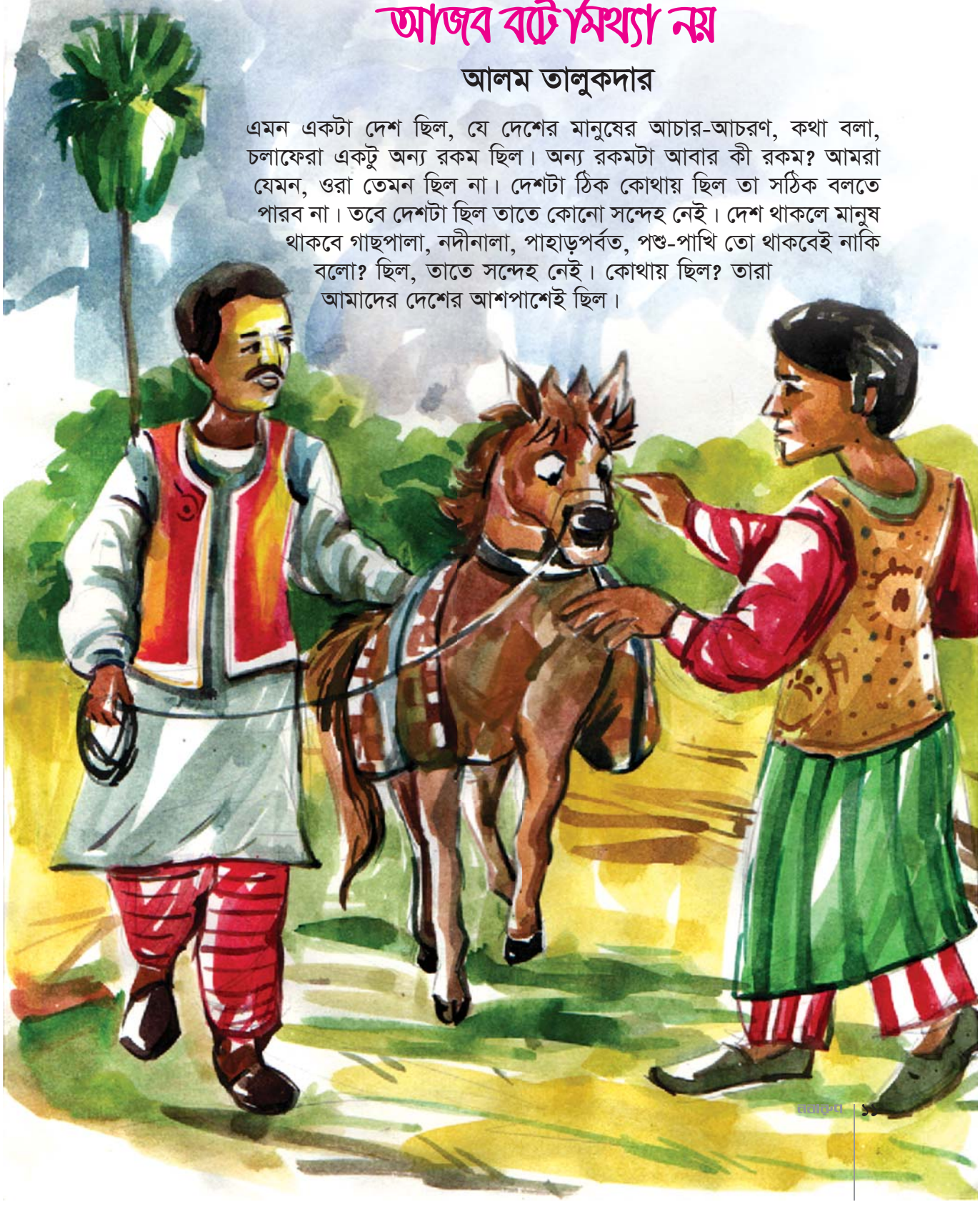

কেউ কেউ খোঁজ পেয়েছিল। তবে একজন যে খোঁজ পেয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজব দেশের কথাটা তোমাদের বলি। দেশের লোকজন মানে ছোটো হতে বড়ো সবাই আমাদের চেয়ে জ্ঞানী ছিল, মানে পণ্ডিত ছিল। তারা অনেক কিছু জানত। পৃথিবীর এমন কোনো বিষয় নেই যা তারা জানত না। এক কথায় সবজান্তা। যুক্তির সাথে বুদ্ধি আর বুদ্ধি এবং যুক্তির মধ্যে কোনো ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। যাকে বলে সরল সোজাভাবে সবকিছু বুঝে যেত। একটা উদাহরণ দেই। যেমন আমরা বলি, এই ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই- আমরা এর ভাবার্থ বুঝি যে, এই কাজটির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই । কিন্তু ওরা সরলভাবে খুঁজবে হাত কোথায়?

ঐ দেশের শিশুরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে দারুণভাবে জানত। সবার কাছেই যন্ত্র ছিল। আইনের চুলচেরা মীমাংসা সবাই দিতে পারত। দেশ-বিদেশ হতে অনেকে এসে জ্ঞান অর্জন করত। আবার অনেকে ফতুর হয়ে যেত। অথবা কেউ কেউ উধাও হয়ে মানে নিখোঁজ হয়ে যেত। এবার ভাবো কেমন একটা আজব দেশ ছিল।

একটা কথা রটে গিয়েছিল যে, তারা জাদু বলে বিদেশিদের ছাগল-ভেড়া বানিয়ে রাখত। তবে এই কথাটা সত্য নয়। আগেই বলেছি তারা সরল-সোজা মানুষ ছিল। যুক্তিতর্কে পটু ছিল বটে কিন্তু সংসার জ্ঞান বা বাস্তব কোনো জ্ঞান ছিল না। অনেকে ভয়ে ঐ দেশে যেত না।

আমাদের দেশ হতে কম আক্কেল নামে একজন ব্যাবসায়ী ঐ দেশে ব্যাবসা করার জন্য হাজির হলো। চলতে চলতে সে দেখল একটা বাজারের প্রবেশ পথে এক লোক চিৎকার করে বলছে- তিন হাজার টাকায় তিনটি কথা, খুব সস্তা যাচ্ছে, কে নেবে নাও। আমার নাম হুসিয়ার খান, আমি সব রকমের প্রবাদ, পরামর্শ ও ভালো ভালো কথা বিক্রি করি।

এই কথাগুলো শুনে কম আক্কেল মিয়া তো অবাক। এত দামের তিনটি কথা কী হতে পারে? সে অনেকক্ষণ চিন্তাভাবনা করে শেষে কথা তিনটি কিনিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। হুসিয়ার খানের কাছে গিয়ে সে তার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তিনখান মোহরের বিনিময়ে সে তিনটি কথা পেল বটে। তবে হতাশও হলো। কী কথা তিনটি তোমরা জানতে চাও? আরে জানাবার জন্যই তো লিখতে বসেছি। মোহর পেয়ে হুসিয়ার খান তাকে চুপি চুপি বলল,

১. রাঁধুনিকে বিশ্বাস করিও না

২. বন্ধুকে বিশ্বাস করিও না

৩. সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস রাখিবে।

কম আক্কেল তিন কথা শুনে আরো বেওয়াক্কেল হয়ে গেল। দূর! জ্ঞানীদের দেশে আইসা দেখি ফাইসা গেলাম। কী আর করা। তো কম আক্কেলের মুখ দেখে হুসিয়ার খান বলল, মন খারাপের কিছু নাই। ঠিক আছে, তোমার যখন মনে হচ্ছে আমি তোমাকে ঠকিয়েছি তাহলে এই নাও কিছু অতিরিক্ত কিছু। এই বলে সে তার ঝোলা হতে আম, জাম, লিচু, আঙুরের কিছু বিচি দিয়ে বলল, এই বিচি পুঁতলেই সাথে সাথে ফল ধরবে এবং পাকবে। ইচ্ছামতো খেয়ে শেষে 'উড়ে যাও' বললেই গাছগুলো উড়ে যাবে। ঠিক আছে?

কম আক্কেল তাতে খুব খুশি হলো। ভাবল তিন হাজার টাকা বৃথা যায় নাই। তাই সে আনন্দিত হয়ে দেশে ফিরে রাঁধুনিকে ঐ আশ্চর্য বিচির কথা বলল। রাঁধুনির বিশ্বাস না হলে সে ঐ আশ্চর্য বিচি ওর সামনেই মাটিতে পুঁতে দিল। সাথে সাথে গাছ হলো, ফল হলো, সেই ফল পেকে গেল। তারা ইচ্ছামতো পেট ভরে ফল খেল। পাড়া-প্রতিবেশীকে বিলাইল। তারপর উড়ে যা বলার সাথে সাথে সব গাছ উড়ে গেল।

তার রাঁধুনি মানে চাকরটা ছিল পাজি এবং লোভী। ঐ চাকরের সাথে কম আক্কেলের এক প্রিয় বন্ধু বেআইনি মালের ব্যাবসা করত। বন্ধুটির সাথে চাকর পরামর্শ করে কীভাবে তার টাকাপয়সা মারা যায়। তার মুনিব তো বিচি এনে বাড়িতেই থাকে। সে ঘর হতে বের না হলে চুরি করতে পারবে না। তাহলে বুদ্ধি কী? আমি তো ওকে ঐ আজব নগরে বুদ্ধি করে পাঠিয়েছিলাম। আশা ছিল ওকে ছাগল বা ভেড়া বানিয়ে রেখে দিবে। এখন তাতো হলো না। এখন কী উপায়? তারা ফন্দিফিকির করে সবকিছু হাতাবার বুদ্ধি বের করল। বন্ধুকে দেখে সে খুব খুশি। তাকে বন্ধুটি বলল, শুনলাম

তুমি কীসব আচানক বীজ এনেছ। সেটা পুঁতে দিলেই ফল ধরে, পেকে যায়। আমার তো বিশ্বাস হয় না। এই কথা শুনে কম আক্কেল মনে মনে চটে গেল। সে বলল, তুমি কী মনে করো আমি মিথ্যা রটনা করেছি?

বন্ধুটি শান্ত স্বরে বলল, আমি তোমার কথাটি অবিশ্বাস করছি না। তবে পৃথিবীতে এমন জিনিস থাকতে পারে সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা, কথা হলো এই গাছ যদি আমার চোখের সামনে গজায় তাহলে তুমি আমার বাড়ির যে জিনিসে প্রথমে হাত দিবে আমি তোমাকে সেই জিনিস দিয়ে দিব। কিন্তু গাছ যদি দেখাতে না পারো তাহলে আমি তোমার বাড়ির যে জিনিসে প্রথমে হাত দিব সেটা আমাকে দিবে। এই শর্তে যদি রাজি থাকো তাহলে দেখাও। কম আক্কেল 'আমি রাজি' বলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চাকরকে ডাকল। তাকে বিচি আনতে হুকুম দিল। চাকর বিচি নিয়ে আসে। সে বন্ধুর সামনে তা রোপণ করল। কিন্তু হায়। গাছ কই? সে ভালো করে বীজগুলো দেখিল। দেখে যা বুঝার বুঝে গেল। সব শয়তান বাবুর্চির কাজ। সে বীজগুলো সিদ্ধ করে রেখেছে। সিদ্ধ বিচি কি আর গজায়? তখন সেই হুসিয়ার খানের কথা মনে পড়ল। বাবুর্চিকে বিশ্বাস করিও না। কম আক্কেল ম্লান মুখে বন্ধুটিকে বলল, 'ভাই দেখো গাছ গজাবে কেমন করিয়া? বিচিগুলো তো সিদ্ধ করা হইয়াছে। আমি হার মানলাম। তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু, দয়া করিয়া যদি তোমার দাবি ছাড়িয়া দাও তাহলে খুব ভালো হয়'।

বন্ধুটি বিদ্রূপ করে বলল, আমি জানতাম এসব। এমন বিচি থেকে গাছ হতেই পারে না। আমি আমার দাবি কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি যদি তোমার কথা ঠিক না রাখো তাহলে আমি সালিশ ডাকব, প্রয়োজনে আদালতে যাব। আমার সাথে চালাকি চলবে না। বেচারা আর কী বলবে। যা বুঝার তা বুঝতে পারল। রাঁধুনি আর বন্ধুর ষড়যন্ত্রের স্বীকার সে। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে পনেরো দিনের সময় ভিক্ষা নিয়ে তার প্রতিজ্ঞা পূরণের আশ্বাস দিয়ে এখনকার মতো বিপদ হতে একটু মুক্তি পেলো। তাও অনেক অনুনয় বিনয় করে আর কী?

এবার কম আক্কেল মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে

কান্নাকাটি করে বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা শুরু করে। সে প্রার্থনায় বলল, হে আল্লাহ তুমি আমাকে এই মহাবিপদ হতে রক্ষা করো। তুমি তো সব জানো। বাবুর্চি আর আমার বন্ধু মিলে আমার সর্বনাশ করেছে। এই বিপদ হতে তুমিই এখন রক্ষা করতে পারো। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। অনেক কান্নাকাটির পর দৈববাণী হলো:

'আজব নগরে যাও' 'হুসিয়ার খানকে খুঁজিয়া বাহির করো।' আর দেরি না করে একটি ঘোড়ায় হিরে-জহরত নিয়ে সেই আজব দেশের উদ্দেশ্যে কম আক্কেল যাত্রা শুরু করে। দুপুরবেলায় সেই দেশে গিয়ে পৌঁছুল। শহরের প্রাচীরের কাছে এসে সে ঘোড়া হতে নামল। তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে লাগল। পথে দেখা হলো এক কসাইয়ের সাথে। সেই কসাই ঘোড়ার পিঠে হাত দিয়া বলিল, ওহে পথিক, এর দাম কত? কম আক্কেল সোজাসুজি বুঝিয়া বলিল, সে তার ঘোড়ার দাম চারশ টাকা। দামটা কিন্তু তখনকার বাজারে বেশ বেশি। ঘোড়াটা রোগা এবং দুর্বল ছিল। কিন্তু কসাই সাথে সাথে ৪০০ টাকা দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়া নিয়ে সোজা হাঁটা দিল। তখন বোকা বনিক বলল, ওহে থামো, থামো, সোনাদানা রাখতে দাও। ওগুলো তো বিক্রি করি নাই। সে কী? তুমি না সবসহ ৪০০ টাকায় দিলে। তখন কি বলেছিলে এসব বাদে ৪০০ টাকা? তখন যদি না বলে থাকো এখন বললে তো হবে না। বোকা আরো বোকা হয়ে সালিশ ডাকল। ঐ দেশের সবার কথাই ঐ কসাইয়ের পক্ষে। রায় পেয়ে কসাই বোকা বণিকের সব নিয়ে হন হন করে তার সামনে দিয়ে ঘোড়াটি নিয়ে চলে গেল।

কম আক্কেল আরো বেক্কেল হয়ে কিছুক্ষণ দম মারিয়া রইল। সে চিন্তা করল কোন দেশে আসলামরে বাবা। কপালে না জানি কী আছে। সব হারিয়ে সে এখন নিঃস্ব।

অনেকক্ষণ পড়ে হুসিয়ার খানের কথা মনে হলো। হাঁটতে হাঁটতে সে দেখতে পেল কয়েকজন বালক খেলা করছে। সে বালকদের কাছে হুসিয়ার খানের বাড়িটা কোনদিকে জিজ্ঞাসা করল। ছেলেরা বলল, তার বাড়ি দেখাইতে পারি। কিন্তু তুমি আমাকে কী দিবে। বোকা বণিক বলল, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো একগাদা মিঠাই দিব।

এই কথা শুনিয়া তারা মাটিতে বসিয়া পড়িল। একজন একটি মানচিত্র, আর একজন একটি মাপকাঠি আনিয়া হাজির করিল। তারপর সূর্যের অবস্থান ও রাহুর গতি এক করিয়া গণনা আরম্ভ করিল। সেই সময় তারা , দ্রাঘিমাংশ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করছিল। এসব শব্দ বোকা বণিক জীবনেও শোনে নাই। সে ভীষণ অবাক হইয়া গাছের মতো দাড়াইয়া থাকিল।

এইভাবে এক ঘণ্টা পার হলো। হঠাৎ তারা চিৎকার করে বলিল, পেয়েছি। পেয়েছি, তারা আনন্দে সোরগোল করে পথ দেখিয়ে হুসিয়ার খানের বাড়ি লইয়া গেল। বোকা তো ছেলেদের বিদ্যার বহর দেখে খুব অবাক। সে তো আর জানে না,ঐ ছেলেরা হুসিয়ার খানের কেউ ছেলে, কেউ কেউ ভাইয়ের ছেলে। তারা বোকা বণিককে বাড়িতে পৌঁছাইয়া পুরস্কারের দাবি করিল। বণিক কথামতো একটা মিঠাই কিনিল কিন্তু ছেলেরা বলিল, আপনি সব থেকে বড়ো একগাদা মিঠাই দিবেন বলেছিলেন। আমরা তাই চাই। আর কিছুই নেব না। বণিক দ্বিগুণ টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু তাতেও তারা রাজি হলো না। এইভাবে সে পঞ্চাশ টাকার মিঠাই দিতে চাইল। কিন্তু তাদের এক কথা। সবচেয়ে বড়ো মিঠাই চাই। আর কিছুই চাই না। এসব বলে আর চিৎকার করে। এমন অদ্ভুত কথা শুনে বোকা তো আরো বোকা। সে তাদের বুঝাতেই পারে না। অনেক টাকা দিচ্ছে। কিন্তু কথার মানেই তারা বুঝতে পারে না।

ঠিক এই অবস্থায় হুসিয়ার খানের প্রবেশ। সে সব শুনে বালকদের বলল, একটু অপেক্ষা করো, সব মীমাংসা করে দিব। এই কথাটি বলে সে এক টাকার মিঠাই কিনিয়া যতজন বালক ছিল ততগুলো সমান ভাগে ভাগ করিয়া বালকদের বলিল, এগুলো কীসের ভাগ? ওরা বলল, মিঠাইয়ের ভাগ। হুসিয়ার খান বলল, বেশ একজন একজন করে আসো, আর সব থেকে বড়োটা তুলে নাও। বালক দেখিল অনেকগুলোর মধ্যে বড়ো একটা ভাগ আছে। সে সেই ভাগ তুলে নিয়ে চলে গেল। যেই আসে সেই বড়ো ভাগটি নিয়ে চলে যায়। এভাবে সকলে ভাগ পাইয়া যায়। হুসিয়ার খান তাদের বলিল,বড়ো ভাগ পাইয়া খুশি হইয়া যাও। ছেলেরা পাঠশালায় ছুটিল। ৫০ টাকার বদলে পাঁচ পয়সার মিঠাই পাইয়া খুশি। তারা কিন্তু তাদের বোকা ভাবে নাই। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় তাদের বোকামীর কাহিনি শুনিয়া আচ্ছা মতো পিটুনি দিয়েছিল। ■

রিমির আশ্চর্য পেনসিল বক্স ও ডিজিটাল দৈত্য

নিশাত সুলতানা

পড়ার টেবিলে মাথা গুঁজে হাপুসহুপুস কাঁদছে রিমি। আজ পাঁচদিন হলো স্কুলে 'হাতে রাখা যোগ অঙ্ক' শুরু করেছেন শায়লা আপা। তিনি বেশ কয়েকবার বুঝিয়ে দিয়েছেন অঙ্কটি করার নিয়মকানুন। কিন্তু রিমি বিষয়টি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। গত তিনদিন ধরে রোজ সন্ধ্যায় বাবাও বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আজ হাতে রাখা যোগ অঙ্কের ওপর হোমওয়ার্ক দিয়েছেন শায়লা আপা। বাবার আজ অফিস থেকে আসতে দেরি হবে। রিমি ভাবছিল, বাবা অফিস থেকে ফিরে আসার আগেই অঙ্কগুলো করে ফেলার চেষ্টা করবে। কিন্তু হোমওয়ার্ক খাতা খুলতেই সেই আগের সমস্যা। কয়েকবার চেষ্টা করে না পেরে কাঁদতে শুরু করল রিমি। তার খুব রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। কাঁদতে কাঁদতে রিমি কখন যেন হাতে তুলে নিয়েছে তার টেবিলে রাখা টিনের পেনসিল বক্সটি। টিনের এই পেনসিল বক্সটি রিমি কয়েকদিন আগে স্কুলের পেছনের বাগানে বন্ধুদের সাথে খেলতে গিয়ে পেয়েছে। লাল রঙের এই পেনসিল বক্সটি কাদামাটির মধ্যে গেঁথে ছিল। লাল রং রিমির খুব পছন্দও। সে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছিল এই পেনসিল বক্সটি তাদের কারো কিনা। সবাই না করেছে। তাই রিমি পেনসিল বক্সটি বাসায় নিয়ে এসেছে। বক্সটির ওপর থেকে কাদামাটি ধুয়ে মুছে তারপর সাজিয়ে রেখেছে পড়ার টেবিলে।

রিমি যখন কান্না করছিল, তখন পেনসিল বক্সটিতে কয়েকবার তার হাতের ঘষা লেগেছিল। কিন্তু বার কয়েক ঘষা খেয়েই পেনসিল বক্সটি রিমির হাতের মধ্যে কাঁপতে শুরু করল। রিমি ভয় পেয়ে পেনসিল

বক্সটি ছুঁড়ে ফেলল টেবিলের ওপর। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল রিমি। তারপর চোখ পিটপিট করে একটু তাকালো। কিন্তু এ কী দেখছে সে! বক্সটি থেকে নীল রঙের ধোঁয়া বের হচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরই ধোঁয়ার সাথে বেরিয়ে এল একটি নীল রঙের দৈত্য। দৈত্যটির মাথা ভর্তি সোনালি চুল আর বেগুনি রঙের দুইটি শিং। চোখে আছে লাল সানগ্লাস, গায়ে কমলা রঙের শার্ট আর হাতে একটি বিশাল মোবাইল ফোন। রংচঙে দৈত্যটি দেখে একটুও ভয় লাগল না রিমির; বরং তার হাসি পাচ্ছে। রিমি আলাদিনের গল্পে শুনেছে, কার্টুন ছবিতেও দেখেছে দৈত্যরা দেখতে খুব ভয়ংকর হয়। কিন্তু পেনসিল বক্সের দৈত্য দেখতে মোটেই ভয়ংকর নয়। রিমি ভাবছে 'বেচারা দৈত্যরা কি আজকাল প্রদীপ না পেয়ে পেনসিল বক্সেই জায়গা করে নিচ্ছে নাকি!'

দুই

দৈত্য রিমিকে দেখে মিটিমিটি হাসছে। তারপর বলল, 'হাই! আমার নাম ক্যাপাহিম্মা মণিকচ। সবাই আমাকে মণিকচ বলেই ডাকে। আমি এই পেনসিল বক্সের দৈত্য। আদেশ করুন আমার মালিক। আপনার তিনটি ইচ্ছে পূরণ করা হবে।'

দৈত্যের নাম শুনে খুব মজা পেল রিমি। বলল, 'মণিকচ! এইটা একটা নাম হলো! আর তুমি আমাকে আপনি আপনি করছ কেন! আমি তোমার চেয়ে কত ছোটো দেখতে পাচ্ছ না! আমাকে নাম ধরেই ডাকবে। আমার নাম রিমি। আমি ক্লাস টু-তে পড়ি। আর আমি কারো মালিক টালিক না।'

দৈত্য বলল, 'ওকে রিমি, তাড়াতাড়ি বলো তুমি কী চাও। আমাদের ওখানে আবার ডিপিএল অর্থাৎ দৈত্য প্রিমিয়ার লীগ শুরু হয়েছে। দেখছ না আমি সানগ্লাস পরে খেলা দেখার জন্য একদম তৈরি! আর একটু পরে খেলা শুরু হবে। আমার বন্ধুরা বার বার ফোন দিচ্ছে। আমাকে ফিরতে হবে।'

রিমি একটু চিন্তা করে বলল, 'আমি হাতে রাখা যোগ অঙ্ক পারছি না। হোমওয়ার্কের খাতা কাল স্কুলে জমা দিতে হবে। অফিস থেকে বাবার ফিরতে দেরি হবে, ওদিকে মায়ের শরীর ভালো না। অঙ্কগুলো জলদি করে দাও দেখি।'

অঙ্কের কথা শুনেই মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল মণিকচের মুখ। মনে মনে বলল, 'এখানেও সেই অঙ্কের যন্ত্রণা! তাও আবার হাতে রাখা যোগ অঙ্ক! আর পারা যায় না বাপু! অঙ্কের অত্যাচারে স্কুল ছেড়েছি। এখানেও দেখছি ঠিক একই সমস্যা।' ভেতরে ভেতরে খুব ভয় পেলেও রিমিকে সে কিছুই বুঝতে দিল না। বলল, 'দেখি তো অঙ্কগুলো।' তারপর সানগ্লাস কপালে তুলে অঙ্কগুলোর পটাপট কয়েকটি ছবি তুলে নিল মোবাইল ফোনে। তারপর ঝটপট তা পাঠিয়ে দিল কোথাও। একটু পরেই বার্তা এল। সে মহাবিজ্ঞের হাসি হেসে রিমির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই নাও তোমার অঙ্কের সমাধান। হ্যাপি নাউ?'

রিমি ঝটপট খাতায় তুলে নিল অঙ্কগুলো। খুব খুশি হয়ে রিমি দৈত্যকে বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

মণিকচ তার শিংয়ে হাত বুলিয়ে হেসে বলল,

তিন

রিমির টনসিলের সমস্যা আছে, একটুতেই ঠান্ডা লাগে। তাই আইসক্রিম খাওয়া তার জন্য একেবারে নিষেধ। কিন্তু আইসক্রিম খেতে ভীষণ মন চায় রিমির। কদিন হলো খুব গরম পড়েছে। স্কুল গেইটে যখন সবাই জটলা করে আইসক্রিম খায়, তখন রিমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কী যে কষ্ট হয়! তার ওপর আজ আবার রিমির সবচেয়ে কাছের বন্ধু পূজা আইসক্রিম খেয়েছে। তাই মন খারাপ করে বাসায় ফিরে এল রিমি। বাসায় ফিরেই চোখ পড়ল পড়ার টেবিলে রাখা পেনসিল বক্সটির ওপর। রিমি ভাবছে, একবার কি ডাকবে নাকি মণিকচকে। আইসক্রিম তো অঙ্কের মতো এমন কোনো জটিল বিষয় নয়। মণিকচ নিশ্চয়ই তাকে আইসক্রিম এনে দিতে পারবে। চিন্তা শুধু একটাই; ঠান্ডা লাগার ভয়। তবু একবার দেখা যাক না!

রিমি পেনসিল বক্স ঘষতে শুরু করল। একটু পরেই নীল রঙের ধোঁয়া ছুটিয়ে সামনে এল মণিকচ। বলল, 'ইয়েস রিমি, আমি হাজির। কিন্তু তোমার মুখে হাসি নেই কেন? কী চাই তোমার? '

আজ মণিকচের চুল নীল ফিতা দিয়ে ঝুঁটি করে বাঁধা। চোখে সানগ্লাস নেই আজ। মণিকচকে দেখেই শায়লা আপার বকার কথা মনে পড়ে গেল রিমির। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। রিমি বলল, 'তোমার মতো এমন অকাজের দৈত্য আর দেখিনি! অঙ্ক পারো না সেকথা বললেই পারতে! শুধু শুধু বকা খেলাম তোমার জন্য। '

রিমির কথা শুনে ভীষণ লজ্জা পেল মণিকচ। বলল, 'হোয়াটস রং? অঙ্ক ভুল হয়েছে? '

রিমি রাগ করে বলল, 'আবার জানতে চাও?'

মণিকচ বলল, 'আই অ্যাম সরি, রিমি। অঙ্কে আমার একটু সমস্যা আছে। কিন্তু আমি তো আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল হিড়িম্বাকেই তোমার অঙ্কগুলো করতে দিয়েছিলাম। কিন্তু কে জানত এই অঙ্কগুলো করতে হিড়িম্বার অবস্থাও আমার মতোই হবে! আমাকে আরেকটা সুযোগ দাও, আমার মালিক। বলো তোমার কী ইচ্ছা। ডিপিএল খেলা শেষ; আমি এখন একদম ফ্রি। '

রিমি আরো রেগে গিয়ে বলল, 'আবার আমাকে মালিক বলছ! তোমাকে না বলেছি আমাকে মালিক বলবে না! এখন তো দেখছি তুমি শুধু অকাজের না, ভুলোমনেরও।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, সুইট গার্ল। এইবার আমি চললাম ডিপিএল দেখতে। দরকার হলে আবার ডাক দিও। তোমার দুটি ইচ্ছা এখনো পূরণ করা বাকি।' এই বলেই মণিকচ নীল রঙের ধোঁয়া ছুটিয়ে আবার ঢুকে পড়ল পেনসিল বক্সের ভেতরে।

পরদিন সকালে দারুণ খুশিমনে হোমওয়ার্কের খাতা জমা দিল রিমি। কিন্তু রিমির খাতা দেখে রাগে মুখ লাল হয়ে গেল শায়লা আপার। বললেন, 'রিমি আজও সব অঙ্ক ভুল করেছ? তুমি কি বাসায় কিছুই প্র্যাকটিস করছ না? ক্লাসের পর দেখা করবে আমার সাথে। আবার নিয়মটি বুঝিয়ে দিব। কেমন?'

রিমির মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, 'দৈত্য মণিকচ কোনো কাজের না। সে শুনেছে দৈত্যদের কত ক্ষমতা! ওরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই পৃথিবীতে। অথচ তার কপালে জুটেছে এমন এক দৈত্য যে কিনা সামান্য অঙ্কের সমাধানও করতে পারে না!' রিমি ঠিক করল সে আর কখনো মণিকচকে ডাকবে না।

মণিকচ বলল, 'আমার দাদুর দাদুর দাদুর দাদু, যিনি আলাদিন সাহেবের প্রদীপে থাকতেন, তিনিও আলাদিন সাহেবকে 'মালিক'ই বলতেন। সেই যে আমরা তোমাদের মালিক বলা শুরু করলাম, এখনো ছাড়তে পারিনি। তার উপর আমার আবার এমনিতেই মনে না রাখার রোগ আছে। '

রিমি বলল, 'শুনেছি তোমরা দৈত্যরা কত কী পারো। এখন তো দেখছি সব ফাঁকি। টাকাপয়সা, ধনদৌলত কিছুই চাইনি আমি। সামান্য অঙ্ক করতে বলেছিলাম তোমায়। তাতেই তোমার যা অবস্থা দেখলাম!'

মণিকচ বলল, 'ডোন্ট মাইন্ড, রিমি। রাগ করো না। তুমি চাইলেও আমি তোমাকে ধনদৌলত এনে দিতে পারব না। কারণ আলাদিন সাহেবদের যুগে আমাদের পূর্বপুরুষরা সব দান-ধ্যান করেই তো আজ আমাদের বারোটা বাজিয়েছেন। সে যাই হোক। এসব নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা করো না। এখন বলো কী চাও তুমি।'

রিমি চটপট বলল, 'আইসক্রিম খেতে চাই; যে আইসক্রিম খেলে আমার ঠান্ডা লাগবে না।'

মণিকচ বলল, 'আর কিছু না? '

রিমি বলল, 'না। শুধু ঠান্ডা না লাগলেই আমি খুশি।'

মণিকচ বলল, 'ওকে। এটা কোনো ব্যাপারই না। আমরা কত আইসক্রিম খাই প্রতিদিন! আমাদের কিন্তু কখনো ঠান্ডা-জ্বর হয় না। এই তো আমার বন্ধু হিড়িম্বা রোজ ২৯টা আইসক্রিম খায়। সে তো দিব্যি আছে। কখনো সামান্য সর্দি হয়েছে বলেও তো শুনিনি। বলো তো রিমি, কয় গাড়ি আইসক্রিম চাই তোমার?'

রিমি খুশি হয়ে বলল, 'বেশি না, আমি তিনটা আইসক্রিম পেলেই খুশি।'

মণিকচ বলল, 'আমি এখনই তোমার জন্য অর্ডার করছি।'

এই বলেই মণিকচ তার মোবাইল ফোন থেকে আইসক্রিমের অর্ডার করল। সাথে সাথে তার হাতে এল তিনটি আইসক্রিম। সে আইসক্রিম বাড়িয়ে দিল রিমির দিকে। রিমি অসম্ভব খুশি। রিমি গপাগপ করে খেয়ে নিল একটি আইসক্রিম। কিন্তু আইসক্রিম খাওয়া মাত্রই হাঁচি শুরু হলো রিমির। সেই হাঁচি থামতেই চায় না। রিমি বুঝে গেল সে আবার বিপদে পড়েছে। মা তার এই অবস্থা দেখলেই বুঝে যাবেন যে রিমি নিশ্চয়ই লুকিয়ে আইসক্রিম খেয়েছে।

রেগে গিয়ে রিমি মণিকচকে বলল, 'এটা তুমি আমাকে কী খাওয়ালে! তুমি না বললে, তোমাদের আইসক্রিম খেলে ঠান্ডা লাগে না। তাহলে আমার এই অবস্থা হলো কেন? আমার তো হাঁচি থামতেই চাইছে না। হা চ্ছ ছ ছ !'

মণিকচ রিমির একটানা হাঁচি দেওয়া দেখে এমনিতেই ভয় পেয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল, 'এমন তো হবার কথা ছিল না!' দাঁড়াও আমি এক্ষুনি ডাক্তার কাম্বা চিলোরোলোকে ফোন করছি।

বলেই মণিকচ চিলোরোলোকে ফোন দিল। ঘটনা শুনেই চিলোরোলো বলল, 'আহা করেছ কী! তুমি কি জানো না, দৈত্যদের কখনো ঠান্ডা লাগে না; সে তুমি ট্রাকে ট্রাকে আইসক্রিম খাও কিংবা অ্যান্টার্কটিকায় বসে রৌদ্রস্নান করো! কিন্তু রিমি তো আর দৈত্য না! ওর তো ঠান্ডা লাগবেই। এখন আর কী করবে ! লাগলে ওষুধ দিতে পারি আমি। '

ডক্টর কাম্বার সাথে কথা শেষ করে ভয়ে কাঁপতে শুরু করল মণিকচ। বলল, 'মাই মালিক রিমি, তোমার জন্য ওষুধ আনি?'

রিমি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি চলে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। এমন অকাজের দৈত্য আমি চাই না। আজ মা এসে আমাকে কী যে করবেন কে জানে!'

মণিকচ তার হাতে থেকে যাওয়া দুটি আইসক্রিম রিমিকে দেখিয়ে বলল, 'এগুলোর কী হবে?'

রিমি রাগে লাল হয়ে বলল, 'আবার জিজ্ঞেস করছ? 'তুমিই খাও ওগুলো পেনসিল বক্সের ভিতরে বসে বসে।'

মণিকচ মাথা চুলকাতে চুলকাতে নীল ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল পেনসিল বক্সে।

চার

প্রায় পনেরো দিন টানা জ্বর আর টনসিলের সমস্যায় ভুগে এই সপ্তাহ থেকে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে রিমি। স্কুল শুরু হতেই ভীষণ পড়ার চাপ। নতুন বই পড়ার পাশাপাশি পুরানো পড়া শেষ করার তাড়া। রিমি কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এখনো শরীর খানিকটা দুর্বল আছে। সপ্তাহ শেষে বৃহস্পতিবারে বাসায় ফিরে নিজের ঘরে ঢুকতেই ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রিমির। তার ঘর এমন এলোমেলো হয়ে আছে যে

নিজেরই বিরক্ত লাগছে। মা অফিস থেকে ফিরে রিমির ঘরের এ অবস্থা দেখলে ভীষণ বকা দেবেন। কিন্তু ঘর ঠিক করতে একটুও ইচ্ছা করছে না রিমির। হঠাৎ রিমির মনে পড়ল পেনসিল বক্সের দৈত্যের কথা। আচ্ছা মণিকচকে ডাকলে কেমন হয়! ঘর গোছানো তো এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। রিমি ঠিক করল সে মণিকচকে ডাকবে।

বিছানায় শুয়ে যেই না রিমি হাত বাড়িয়ে পেনসিল বক্সটি নিতে গেছে, অমনি টেবিলের উপরে রাখা গ্লাসটির সম্পূর্ণ পানি টেবিলে পড়ে গেল। গ্লাসের পানিতে লাল টেবিল ক্লথটি ভিজে একেবারে চুপচুপে। রিমি বিছানা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি ডেকে নিল মণিকচকে। নীল ধোঁয়া উড়িয়ে রিমির সামনে হাজির হলো মণিকচ। বলল, 'রিমি, সুইট গার্ল, তোমার হাঁচি দেখছি বন্ধ হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি নিশ্চয়ই আমাকে হাঁচি থামানোর জন্য ডাকবে।'

রিমি মণিকচের কথা শুনে হেসে ফেলল। রিমি দেখল, এই কদিনে মণিকচ কেমন শুকিয়ে গেছে। রিমি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোমার?'

মণিকচ বলল, 'ডায়রিয়া। গত দুদিন ধরে আমার বেশিরভাগ সময়ই টয়লেটে কাটছে। তাড়াতাড়ি বলো কী চাও। আমার কিন্তু যে-কোনো সময় আবার টয়লেটে দৌড়াতে হবে।'

রিমি শুনে বলল, 'দৈত্যদেরও ডায়রিয়া হয় নাকি? তা তুমি তোমার ডাক্তার চিলোরোলোকে দেখালেই পারো।'

মণিকচ বলল, 'আর বলো না চিলোরোলোর কথা। বেচারা চিলোরোলোর টাইফয়েড হয়েছিল। এরপর যে কী হলো, সে জ্বর হলে পেট খারাপের ওষুধ আর পেট খারাপ হলে হুপিংকাশির ওষুধ দিচ্ছে। তুমি চিন্তা করো না রিমি, দৈত্যদের পেট খারাপ এমনিতেই পাঁচদিনে সেরে যায়। এখন বলো কী চাও।'

রিমি বলল, 'তেমন কিছু না, এই ঘরটা গুছিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তোমার তো শরীর খারাপ। থাক লাগবে না। তুমি আরাম করো।'

হা হা করে হেসে উঠল মণিকচ। বলল, 'এ এমন কিছু না। আমি এক্ষুনি তোমার ঘর ঠিক করে দিচ্ছি।' এই কথা বলেই মণিকচ রিমির পড়ার টেবিল ক্লথ ধরে একটান দিল। এরপর একদৌড়ে তা রেখে এল ময়লা কাপড় রাখার ঝুড়িতে। তারপর গোছাতে লাগল রিমির বইখাতা, কাপড়চোপড় সবকিছু। সবকিছু গোছানোর সে কী তোড়জোর। বেশ খুশিই লাগছে রিমির। খুশিমনে সে বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। হঠাৎ ময়লা কাপড় রাখার ঝুড়িতে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলো রিমি। এ কী করেছে মণিকচ। মায়ের ধবধবে সাদা শাড়ির ওপর ভেজা লাল টেবিল ক্লথটি রেখেছে সে। সাদা শাড়িতে লাল রং লেগে মাখামাখি অবস্থা। এই সাদা শাড়িটি মায়ের খুব পছন্দের। মা জিজ্ঞেস করলে কী বলবে এই ভয়েই রিমির হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ রিমির ঘর থেকে ঝনঝন শব্দ। দৌড়ে এল রিমি। দেখল সেলফের ওপর থেকে তার খুব পছন্দের কাঁচের ফুলদানিটি পড়ে ভেঙে চুরমার। আর মণিকচ হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে ফুলদানির কাঁচের টুকরাগুলোর দিকে। একদিকে মায়ের সাদা শাড়িতে লাল রঙের দাগ আর অন্যদিকে ভেঙে যাওয়া কাঁচের ফুলদানি; সবকিছু মিলিয়ে রিমির মাথা ঘুরছে।

রিমিকে দেখে মণিকচ এগিয়ে এল। বলল, 'এই ফুলদানিটা কীসের তৈরি বলো তো? ফুলদানি ভাঙার শব্দটা ভারি মিষ্টি! এই শব্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। তোমার বাসায় এরকম আরো জিনিস আছে? আসো, আমরা সবকিছু ভাঙি আর নাচ করি।'

এই কথা শুনে রিমির এত রাগ হলো যে ঠিকমতো কথাও বলতে পারল না। শুধু কোনোরকমে বলল, 'মণিকচ, তুমি বিদায় হও, যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর কিছু চাই না তোমার কাছে। ফিরে যাও তুমি। আর কখনো আসবে না আমার সামনে।'

মণিকচ বলল, 'আমার এমনিতেই এক্ষুনি ফিরতে হবে। পেট ব্যথা করছে, টয়লেট পেয়েছে।'

রিমি বলল, 'তা-ই যাও। তাড়াতাড়ি যাও।'

মণিকচ বলল, 'গুড বাই, আমার মালিক। ভালো থেকো রিমি।' নীল ধোঁয়া উড়িয়ে মণিকচ ফিরে গেল পেনসিল বক্সে।

পরদিন বেশ সকালে রিমি পৌঁছে গেল স্কুলে। তারপর সবার আড়ালে স্কুলের পেছনের বাগানের কাদামাটিতে রেখে এল পেনসিল বক্সটি যেখানে সে একদিন খুঁজে পেয়েছিল এই পেনসিল বক্সটি। ■

নিবন্ধ

শিশু-কিশোরদের নাগালে সোস্যাল মিডিয়া
কী পাচ্ছি কী হারাচ্ছি

ড. মোহাম্মদ হাননান

'সোস্যাল মিডিয়া' নামক জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ইতিহাসে সর্বশেষ (বিবিসি, ১২ জুলাই ২০১৯) খবরটি হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি 'ফেসবুক' কর্তৃপক্ষকে ৫০০ কোটি টাকা জরিমানা করেছে। সামাজিক গণমাধ্যমটিতে মূলত ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি বলে। 'ফেসবুক' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই জন্ম নিয়েছিল। ২০০৪ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মার্ক জাকারবার্গ প্রথম 'ফেসবুক' নেটওয়ার্কটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুরুতে হার্ভার্ড-এর ছাত্ররাই এটা ব্যবহার করত। কিন্তু খুব দ্রুতই এটি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বে এখন দুইশত কোটিরও বেশি মানুষের 'ফেসবুক' একাউন্ট রয়েছে। বাংলাদেশের দুই কোটিরও বেশি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে থাকে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তো শুধু ফেসবুকই নয়, এর আওতায় রয়েছে ইউটিউব, হোয়াটস অ্যাপ, মেসেঞ্জার, উইচ্যাট ইত্যাদিও। বিশ্বব্যাপী এদেরও কোটি কোটি গ্রাহক ও সদস্য রয়েছে। দেখা যাচ্ছে মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহারকারীর বেশিরভাগই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে আছে। আর তাই এ প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমরা কখনোই উচ্চকণ্ঠে জোর গলায় কিছু বলতে পারব না। সোস্যাল মিডিয়াখ্যাত এ প্রযুক্তি আমাদের দুনিয়ার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সকল প্রান্তের মানুষের সঙ্গে মেলবন্ধনে যুক্ত করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানুষে মানুষে সামাজিকভাবে যে দূরত্ব ছিল, তা কিন্তু সোস্যাল মিডিয়া নিরঙ্কুশভাবে দূর করে দিয়েছে। বন্ধু তৈরি করে দিচ্ছে, মতামত শেয়ার করা যাচ্ছে। এ মিডিয়া যেন এক নতুন বিশ্ব তৈরি করে ফেলেছে!

কিন্তু সমস্যা তৈরি হলো সেখানে যখন মানুষ হয়ে গেল প্রযুক্তির দাস! প্রযুক্তিকে মানুষ এখন আর যেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। অথচ কথা ছিল, প্রযুক্তিই মানুষের দাস হয়ে থাকবে, মানুষ যখন ইচ্ছা তা ভালো কাজে ব্যবহার করবে। কিন্তু মানুষ, বিশেষ করে শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবকরা সোস্যাল মিডিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা এখন দাবানলের মতো বিশ্বের সকল দুয়ারে আঘাত করছে। এ বিষবাষ্প পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে সকল সৃজনশীলতা, মননশীলতা এবং চিন্তাশীলতা। মেধার বিকাশ ও বুদ্ধিজীবীতায় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে দেশে দেশে, বাংলাদেশেও।

সোস্যাল মিডিয়া নিয়ে প্রধান সমস্যাটা আসক্তির। যে-কোনো কিছুরই আসক্তি ক্ষতিকর। আমরা শিশু-কিশোরদের পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে অন্যান্য গল্প-প্রবন্ধ ও জ্ঞানের বই পড়তে বলি, অথচ যখন কিশোরটি শুধু গল্পের বই নিয়েই পড়ে থাকে, পাঠ্যবইয়ে নজর দেয় না, পরীক্ষায় খারাপ করে বসে, তখন কিন্তু এটাকে আমরা আসক্তি বলি। এটা আমাদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে। আমরা এমনটা চাই না। আমরা চাই আমাদের সন্তানরা প্রথম পড়ুক পাঠ্যবই, তার সাথে সহায়ক জ্ঞানের বইও। অথচ শুধু প্রযুক্তি নিয়ে পড়ে থাকলে প্রযুক্তির গোলাম হয়ে যায় মানুষ। আসক্তি আমাদের প্রকৃত আনন্দ ও বিনোদন থেকেও দূরে রাখে। ২রা জুলাই ২০১৯ এবং ৫ই জুলাই ২০১৯ ছিল বাংলাদেশ-ভারত ও বাংলাদেশ-পাকিস্তানের বিশ্বকাপ খেলা। এদুটো খেলাতেই খুবই উত্তেজনা ছিল, ছিল লড়াকু মেজাজের আনন্দ। অথচ দেখা যাচ্ছে মহল্লায় অনেক কিশোর-তরুণরাই খেলা দেখা বাদ দিয়ে মোবাইল চ্যাটিং-এ নিমগ্ন। কোনো সুস্থ কিশোর-তরুণ এ দেশপ্রেমমূলক খেলা দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে, এটা কল্পনার বাইরে। এ থেকেই বোঝা যায় প্রযুক্তিতে আসক্তি কতটাই আগ্রাসী।

একবার আমি আমার এক পরিচিত মানুষের বাসায় গিয়েছি। সেখানে কম্পিউটারটি রয়েছে ড্রইংরুমেই। বাসার কিশোর-সন্তানটি কোনো এক সোস্যাল মিডিয়ায় লাইক, শেয়ার বা চ্যাটিং-এ ব্যস্ত। কে ঘরে ঢুকল, কে বের হয়ে গেল তার প্রতি ওর কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ নেই। কিশোরের মা অস্বস্তিতে পড়লেন, বললেন, 'বাবু তোমার চাচ্চু এসেছেন, সালাম দাও'। বাবু খুব গম্ভীরভাবে মাথা নিমগ্ন রেখেই উত্তর দিল, 'Who is the guy'। সবাই বিব্রত হয়ে গেল। পরিস্থিতি এখন এমনই। শিশু-কিশোর-তরুণরা গভীর রাত পর্যন্ত জাগছে, কখনো সারারাত। ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে এর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তাদের নিয়মিত লেখাপড়ায়ও। এভাবে শারিরীক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে আমাদের শিশু-কিশোররা।

জীবনে ইতিবাচক কিছু আনার চেয়ে ফেসবুক নেতিবাচকতা বয়ে এনেছে বেশি। ফেসবুকে মানুষ এখন তার জীবনের সবকিছুই দিয়ে দিচ্ছে। অথচ মানুষের দেয়া তথ্য কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞাপন থেকে প্রচুর অর্থ আয় করছে ফেসবুক। আমাদের সবকিছু, এমনকি হৃদয়স্পন্দন পর্যন্ত নানা ডিভাইস ব্যবহার করে শুনতে পাচ্ছে এসব মাধ্যমে।

কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নায়েম 'সোস্যাল মিডিয়া পার্টিসিপেশন অব দ্য সেকেন্ডারি স্কুলস ইন ঢাকা সিটি' শিরোনামে এক গবেষণা জরিপ করেছে সম্প্রতি। প্রতিবেদনটিতে বের হয়ে এসেছে, ঢাকা শহরের শতকরা ৩০ ভাগ স্কুল-ছাত্র স্কুলের আঙিনায় বসেই সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে থাকে। শতকরা ১৩ ভাগ স্কুল-ছাত্র ক্লাসে পাঠদানকালে শিক্ষকের উপস্থিতিতেই ফেসবুক বা চ্যাটিং-এ নিজেকে ব্যস্ত রাখে। শতকরা ১৪ ভাগ শিক্ষার্থী ৩ ঘণ্টারও বেশি সময় প্রতিদিন সোস্যাল মিডিয়ায় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমাদের শিক্ষকরা, আমাদের অভিভাকররা এর সবই জানেন। এসব কর্মকাণ্ডের প্রতি

আবার মিডিয়ারও অনেক উস্কানি আছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে একটি বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে যে, একজন শিক্ষার্থী ক্লাসে না এসে রাস্তায় রিকসা থেকেই রোল কলের সময় ক্লাসে হাজির। বন্ধুর মোবাইলের মাধ্যমে 'উপস্থিতি' দিচ্ছে। দেশের কোনো এক বন্ধ করা মোবাইল কোম্পানির বিজ্ঞাপন এটি, যা কিনা ক্লাসে অনুপস্থিতির মতো এক সাংঘাতিক অপরাধকে সমর্থন করছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, এমন করে ক্লাসে না গিয়ে রাস্তা থেকেই ক্লাসে উপস্থিত থাকা যায়, উত্তর দেয়া যায়, এমন একটা ভুল ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে দেশে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিতে আসক্ত হয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ছে। হারিয়ে ফেলছে সামাজিক মূল্যবোধ। খেলাধুলায় আর নেই তারা। তারা লেখাপড়ার গ্রুপ স্টাডির বাইরেই থাকছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রযুক্তিতে ডুবে থেকে ঘাড়ও বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এসব কিশোর-তরুণদের। মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপল-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াক সম্প্রতি ফেসবুক নিয়ে কতগুলো চরম কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের প্রাইভেসি নষ্ট করে ফেসবুকের সুবিধা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে কীভাবে ফেসবুক ছাড়া যায়, তা খুঁজে দেখা। মানুষ মনে করে, এসব সাইটে তাদের প্রাইভেসি আছে। কিন্তু আসলে প্রাইভেসি নেই। আমার জীবনে ইতিবাচক কিছু আনার চেয়ে ফেসবুক নেতিবাচকতা বয়ে এনেছে বেশি। ফেসবুকে মানুষ এখন তার জীবনের সবকিছুই দিয়ে দিচ্ছে। অথচ মানুষের দেয়া তথ্য কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞাপন থেকে প্রচুর অর্থ আয় করছে ফেসবুক। আমাদের সবকিছু, এমনকি হৃদয়স্পন্দন পর্যন্ত নানা ডিভাইস ব্যবহার করে শুনতে পাচ্ছে এসব মাধ্যমে। [১১ই জুলাই ২০১৯, বৃহস্পতিবার, ওয়াশিংটনে টিএমজেড-কে সাক্ষাৎকার দানকালে অ্যাপল-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াক এসব কথা বলেন। সূত্র: ইন্টারনেট]।

কথাগুলো কে বলেছেন খেয়াল করুন। তিনি প্রযুক্তি সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে নিশ্চয় অনেক বেশি জানেন ! তবে এটাও সত্য যে, আমরা প্রযুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না। শুধু প্রযুক্তি যেন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, বরং প্রযুক্তিই থাকে আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে, সেদিকে খেয়াল রাখব। প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে আমরা থাকব নিরাপদ এবং তা আমাদের সকলকেই আসক্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

প্রযুক্তিতে আসক্তি, এ সমস্যা এখন আর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। এটা যুগপৎ জাতীয় এবং বৈশ্বিক সমস্যা। ফলে এর সমাধানও সেভাবেই আসবে। আমেরিকান সরকারের ফেসবুককে ৫০০ কোটি ডলার জরিমানা করার মতো শাস্তি অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের শিশু-কিশোরদের রক্ষার্থে জাতীয়ভাবে যেসব পদক্ষেপ আছে, তা আগে কার্যকর করে তুলতে হবে। ২০১৭ সালে শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আদেশটি বাস্তবায়নে সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। শুধু স্কুলের শিক্ষক কড়াকড়ি করবেন, এমন ভাবনায় থাকলে চলবে না। পরিবার ও অভিভাবকরা সে ডিভাইসগুলো কখনোই আমাদের সন্তানদের জন্যে সরবরাহ করবে না, যা দিয়ে তাদের অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

ফ্রান্সের সরকার পার্লামেন্টে আইন পাস করেছে যে, ১৫ বছরের নিচে কোনো শিশু-কিশোরের হাতে স্মার্টফোন, ট্যাবলেট বা ইন্টারনেট সংযুক্ত ডিভাইস বা এ ধরনের কাজ করতে পারে এমন মোবাইল নয়। আমাদের এটা করার জন্য আইন হওয়ার অপেক্ষা আর নয়, আমরা উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় সন্তানদের বোঝাব কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ। জোরজবরদস্তি বা চাপ নয়, মানসিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এমন কোনো আচরণ দ্বারাও নয়, আমরা আমাদের শিশুদের বোঝাব তাদের মতো করে এসব থেকে বিরত থাকতে।

বাবা-মা তাদের ছোটোবেলার গল্প সন্তানদের শোনাবেন। সন্তানদের তারা প্রিয় বইগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। ভ্রমণকাহিনি পড়তে বলবেন। ভ্রমণেও নিয়ে যাবেন। সমাজে কোনগুলো ভালো কাজ, কোনগুলো মন্দ, তা সন্তানদের কাছে তুলে ধরবেন। সমাজের বড়ো ও গুণী মানুষদের জীবন ইতিহাস তুলে ধরবেন। সামাজিক মূল্যবোধ কী তা বুঝিয়ে বলবেন। বোঝাতে বোঝাতে একসময় সন্তানরা নিজেই নিশ্চই সুস্থ জীবন ধারায় ফিরে আসবে এবং তা হবেই। ■

প্রযুক্তিকে মানুষ এখন আর যেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। অথচ কথা ছিল, প্রযুক্তিই মানুষের দাস হয়ে থাকবে, মানুষ যখন ইচ্ছা তা ভালো কাজে ব্যবহার করবে। কিন্তু মানুষ, বিশেষ করে শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবকরা সোস্যাল মিডিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

কবিতাগুচ্ছ

সোনার দেশ বাংলাদেশ

গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

আমার এ দেশ বাংলাদেশ
বন পাহাড়ে ঘেরা
সোনার এ দেশ বাংলাদেশ
সকল দেশের সেরা।

রূপে রূপে অপরূপা
আমার এ দেশ ভাই
নয়ন মন যায় ভরে যায়
যেদিক পানে চাই।

মাঠের বুকে সোনার ফসল
চাষির কণ্ঠে গান
বিলে ঝিলে শাপলা শালুক
ছড়ায় হাসির বান।

এই দেশেতে জন্ম নিয়ে
ধন্য মানি মোরা।
ষড়ঋতুর খেলা চলে
পরান আকুল করা।

শীত

আমিরুল হক

পৌষের পিঠে চড়ে আসে
কাঁপিয়ে শীতকাল
শীতের ভয়ে জড়সড়
কারো হয় বেহাল।

কনকনে হিমেল হাওয়া
জড়িয়ে এসে ধরে
রসের পিঠা খাওয়ার যে ধুম
সবার ঘরে ঘরে।

শীতের আমেজ ছোটো-বড়ো
সবার কাছে সমান
রং-বেরঙের ফুলের বাহার
রাখে তারই প্রমাণ।

ফুলের সুবাস ছড়িয়ে শীত
মাঘে নেয় বিদায়
প্রকৃতিও মলিন থাকে
দারুণ বিষণ্নতায়।

শিশির ঝড়ে ঘাসে

ফারুক হাসান

শিশির ঝরে টাপুরটুপুর
ছড়িয়ে আলো হাজার নূপুর
সবাই যখন মগ্ন উমে
শীতটা ঢোকে আমার রুমে।

ঠকঠকঠক কাঁপতে থাকি
সুয্যি মামা দিচ্ছে ফাঁকি,
আজ রাত মনে হয়
শূন্য তাপে তাই বড়ো ভয়।

শিশির ঝরে টাপুরটুপুর
গন্ধ বিলায় অঘ্রানের সুর
শীতটা তো নয় ভয়ের কারণ
বাইরে যেতে তবুও বারণ।

আঁকতে পারি

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

আঁকতে পারি ভোরের সূর্য
নীল আকাশের ছবি
পাহাড়-পর্বত, ঝরনাধারা
পুকুরঘাট সব-ই।

আঁকতে পারি সাগর জল
নদীর জলের মাছ
জেলে ভাইয়ের ডিঙি নৌকা
আরো সবুজ গাছ।

আঁকতে পারি নদনদী আর
স্বচ্ছ বিলের পানি
যেইখানেতে মাছেরা সব
করে কানাকানি।

আঁকতে পারি রবি-নজরুল
আরো যত কবি
ছায়াঢাকা পাহাড় ঘেরা
বাংলা মায়ের ছবি।

আঁকতে গেলে আঁকা আমার
হয় না যে আর শেষ
হৃদয় জুড়ে আঁকছি আমি
সোনার বাংলাদেশ।

সোনার বাংলা

মো. তুহিন হোসেন

সোনার বাংলা তোমায় আমি
অনেক ভালোবাসি
তুমি যেন ভুবন জুড়ানো
মায়ের মুখের হাসি।

তুমি আমার মাতৃভূমি
অফুরন্ত আশা
তোমার জন্য রইল আমার
অকৃত্রিম ভালোবাসা

সপ্তম শ্রেণি, কুমিল্লা জেলা স্কুল, কুমিল্লা

হেমন্ত

মারিয়া আদনীন

পাকা ধানের গন্ধে
মন ভরে যায় আনন্দে।
শিশির ঝরে ঘাসে ঘাসে
দূর নীলিমায় মেঘেরা ভাসে
ধান পেকেছে মাঠে মাঠে
হাসিমুখে চাষি হাঁটে
গাছের ডালে পাখি ডাকে
বাজে বাঁশি নদীর বাঁকে
ধুম পড়ে যায় নেই অবসর
নবান্ন উৎসবে হই মশগুল।

১০ম শ্রেণি, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়

নিবন্ধ

৩০০ বছর পূর্তি

রবিনসন ক্রুসো

শামস্ নূর

ছোট্ট একটি দ্বীপ, একজন কিশোর আর একরাশ গাছগাছালি ও কিছু পশুপাখি। চারদিকে কেবল পানি, পানি, পানি আর পানি। নির্জন, নিঃসঙ্গ, নিশ্চুপ এক দ্বীপ। উনিশ বছর বয়েসি অভিযান প্রিয় এক কিশোর জাহাজে চড়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির ফলে উত্তাল সমুদ্রে তাদের জাহাজডুবি ঘটে। উত্তাল সমুদ্রে একটি কাঠের টুকরোয় ভাসতে ভাসতে এই কিশোর কোনোমতে ছোট্ট এই দ্বীপটিতে এসে পৌঁছে। ভাগ্যহত এই কিশোরের নাম রবিনসন ক্রুসো। কিন্তু, দ্বীপটিতে কথা বলার মতো কোনো মানুষ নেই, নেই কোনো বন্ধুজন, কোনো সঙ্গী-সাথি। কথা বলার মতো সঙ্গী বলতে শুধুমাত্র একটি কাকাতুয়া–যার নাম পল। আর যারা সঙ্গী হয়ে আসে তারা হলো- কয়েকটি বিড়াল ও একটি কুকুর।

আটাশ বছর নির্জন এই দ্বীপে বলতে গেলে একাকী সময় কাটে রবিনসন ক্রুসোর। শেষের কয়েক বছর ফ্রাইডেকে পায় সাথি হিসেবে। সেও এক চমৎকার ঘটনা। নরখাদক বর্বরদের হাত থেকে রক্ষা করার আশ্চর্য লোমহর্ষক এক কাহিনি। আরো বিস্ময়ের সৃষ্টি করে দ্বীপ থেকে সভ্যজগতে ফিরে আসার ঘটনা। তারপর নতুন আরেক অভিযান।

বিশ্ববিখ্যাত এই উপন্যাসটির নাম 'রবিনসন ক্রুসো'। আর এটির লেখক হলেন ড্যানিয়েল ডিফো (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৬৬০–২৪শে এপ্রিল ১৭৩১)। ডিফোর জন্ম ইংল্যান্ডের এক বনেদি পরিবারে। কিন্তু আজও তাঁর বিশ্বজোড়া পরিচয় কালজয়ী এক অমর কাহিনির রচয়িতা রূপে। তিনি 'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসের কাহিনির উৎস লাভ করেছিলেন বাস্তবের একটি ঘটনা অবলম্বনে। খুব সাধারণ একটি ঘটনা প্রতিভাধর কাহিনিকারের কলমে যে কত মনোরম ও কত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে 'রবিনসন ক্রুসো' তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ।

আলেকজান্ডার সেলকার্ক (১৬৭৬-১৭২১)

ডিফোর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'রবিনসন ক্রুসো'র মূলে আছে একটি সত্য ঘটনা। আলেকজান্ডার সেলকার্কের নির্জন পরিত্যক্ত বন্দি জীবনই এটির কাহিনির মূল বিষয়। সেলকার্ক চিলির উপকূল থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসগরে অবস্থিত হুয়ান ফারনান্দেজ দ্বীপপুঞ্জের ম্যাস আটিয়েরা দ্বীপে চার বছর অবস্থান করেন। যদিও ক্রুসোর উপন্যাসে দ্বীপটির বিবরণ অনুযায়ী ক্যারিবিয়ান টোবাগো দ্বীপের বর্ণনা মতো লেখা হয়। কেননা, এই দ্বীপটি ওরিনোকো নদীর মোহনার কাছে ভেনেজুয়েলা উপকূলের কিছুটা উত্তরে এবং ত্রিনিদাদ দ্বীপের কাছে অবস্থিত।

১৭০৪ সালে আলেকজান্ডার সেলকার্কের জাহাজাডুবির ঘটনা মতান্তরে নির্জন-জনমানবহীন হুয়ান ফারনান্দেজ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ। আলেকজান্ডার সেলকার্ক (Alexander Selkrik)-এর জাহাজডুবির বিবরণ সংবাদপত্রে পড়েই ডিফো এই উপন্যাস লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। পাঁচ বছর নির্জন দ্বীপে কাটিয়ে সেলকার্ক ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন।

স্কটিশ নাবিক আলেকজান্ডার সেলকার্কের নির্বাসিত জীবনের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। এই কাহিনির নায়ক রবিনসন ক্রুসো একজন সংগ্রামী, আত্মবিশ্বাসী মানুষের প্রতীক। সে সময় ইংরেজ নাবিক ও জলদস্যু ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ড্যামপিয়র (১৬৫২-১৭১৫) ছিলেন খ্যাতি ও অখ্যাতি দুটোরই শীর্ষে। তিনি দু'বার অস্ট্রেলিয়ার উপকূল অভিযানে যান। ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দের অভিযানে তার জাহাজের সঙ্গী হয়েছিলেন আলেকজান্ডার সেলকার্ক নামে একজন নাবিক। তার আচরণে বিরক্ত হয়ে ড্যামপিয়র যে নির্দয় ব্যবহার করেন, সেদিন তার ধারণায়ও নিশ্চয়ই ছিল না একদিন তা কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। ড্যামপিয়র অবাধ্যতার জন্য সেলকার্ককে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের হুয়ান ফারনান্দেজ নামে এক পর্বতময় নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দেন। দীর্ঘ চার বছর সেই দ্বীপে বসবাসের পর সেলকার্ক ফিরে আসেন।

মতান্তরে জানা যায়, অভিযানের মাঝপথে উইলিয়াম ড্যামপিয়রের মৃত্যু হয়। তার স্থলে দায়িত্ব পালন করতে আসেন ক্যাপ্টেন স্ট্রাডলিং। কিন্তু তার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না সেলকার্কের। এক সময় ঠিক করলেন এই ক্যাপ্টেনের অধীনে আর কাজ করবেন না। স্ট্রাডলিং হুয়ান ফারনান্দেজ দ্বীপে গেলেন আগে ছেড়ে আসা তাদের ছয়জন নাবিক ও খাবারদাবার জাহাজে তুলে নিতে। তারা কথায় কথায় সেলকার্ককে বললেন, 'এটা দ্বীপ নয়, যেন এক স্বর্গ।' শুনেই সেলকার্কের মনে

বিদ্যুৎ খেলে গেল। অবশেষে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন, এই দ্বীপে থেকে যাবেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন তার এই সিদ্ধান্তে বাধা দিলেন না। জাহাজ থেকে নামার সময় আলেকজান্ডার সেলকার্ক কিছু বারুদ ও খাবার সঙ্গে নিলেন। মালপত্র নিয়ে একটি নৌকায় করে তিনি দ্বীপে পৌঁছালেন। জাহাজ চলে যাবার সময় সেলকার্কের আবার জাহাজে ফেরার ইচ্ছে হলো। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেক অনেক দূরে চলে গেছে জাহাজটি। বুক ফেটে কান্না পেল সেলকার্কের। কী করে থাকবে নির্জন এই দ্বীপে! একা একা, খুব একা, বড়ো একা সে।

অন্য এক তথ্যে জানা যায়, একটি ব্রিটিশ দস্যু জাহাজ দ্বীপে এসে নোঙর করে। অন্য জাহাজের সঙ্গে লড়াইয়ের পর জাহাজটিতে ছিদ্র দিয়ে পানি ঢোকা শুরু করে। জাহাজের নাবিকদের একজন ছিলেন তরুণ বয়সি স্কটল্যান্ডের নাগরিক আলেকজান্ডার সেলকার্ক। সেলকার্কের কথায়, জাহাজটির এমন হাল হয়েছিল যে সেটি নিয়ে নতুন করে যাত্রার কথা চিন্তা করা ছিল অবান্তর। বিষয়টি তিনি ক্যাপ্টেনকে জানিয়েও ছিলেন। এরপর ঠিক কী ঘটেছিল, তা স্পষ্ট নয়। সেলকার্ক ওই জাহাজে আবারও যাত্রা করতে অস্বীকৃতি জানান, নাকি তাকে একাই দ্বীপটিতে জোরপূর্বক ফেলে যাওয়া হয়; তা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে। তবে তৎকালের জনবসতিহীন সেই ছোট্ট দ্বীপটিতে তিনি একাই রয়ে গেলেন।

ইংল্যান্ডে ফেরার পর পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে সেলকার্কের বিচিত্র কাহিনি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ডিফো সেই বাস্তব কাহিনির ওপর ভিত্তি করে লিখলেন 'রবিনসন ক্রুসো'। বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত এক উপন্যাস। মানুষের অদম্য মনোবল কীভাবে বিরুদ্ধ পরিবেশ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে পরাভূত করে বিজয়ী হয়ে ওঠে–কাহিনির ক্রুসো নিজের জীবনে তা প্রমাণ করেছেন। ডিফো'র এই কাহিনি এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে পরবর্তীকালে 'রবিনসন ক্রুসো'র অনুকরণে অনেক অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযান কাহিনি রচিত হয়েছে। কিন্তু রচনার তিনশ বছর পরও উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে ডিফোর কাহিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এই গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে।

ইবনে তুফায়েল

কোনো কোনো গবেষকের মতে, আরবি ভাষার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ইবনে তুফায়েল (আনুমানিক ১১০৫-১১৮৫)-এর উপন্যাস 'হাই ইবনে ইয়াকযান' (Hayy Ibn Yaqzan অর্থাৎ–A life, son of Awake–*সদাজীবিতের জাগ্রত পুত্র*) উপন্যাসটির ইংরেজি ও ল্যাটিন অনুবাদ থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন ডিফো। ইবনে তুফায়েল ছিলেন একাধারে লেখক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, চিকিৎসক, উজির ও দরবারের কর্মকর্তা। তবে বিশ্বসাহিত্যের প্রথম দার্শনিক উপন্যাস 'হাই ইবনের ইয়াকযান' রচনার জন্য তিনি অধিক সমাদৃত।

ইতিহাসের পাতায় স্পেনে মুসলিম শাসনকালে বহু কীর্তি-কাহিনি ছড়িয়ে আছে। স্পেনের সেই গৌরবের যুগেই ইবনে তুফায়েল 'হাই ইবনে ইয়াকযান'-এর কাহিনি রচনা করেন। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রচিত এই কাহিনির উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণার একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করা।

'হাই ইবনে ইয়াকযান'-এর কাহিনিটি এরকম–ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেরই কোনো এক দ্বীপে এক অহংকারী রাজা বাস করতেন। তার এক রূপবতী বোন ছিল। তিনি কাউকেই তার বোনের যোগ্য পাত্র বলে মনে করতেন না। তার এরকম খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে বোনেরও আর বিয়ে হয় না। এরকম অবস্থায় রাজা কিছুদিনের জন্য রাজ্যের বাইরে চলে গেলেন। এই সুযোগে পরিবারের সবাই মিলে তার রূপবতী বোনের বিয়ে দিয়ে দিল এক যুবকের সঙ্গে। বোনটি এক পুত্র সন্তানের মা হলেন। এক সময় সেই অহংকারী রাজা ফিরে এলেন দেশে।

এদিকে তাড়াতাড়ি করে শিশুসন্তানটিকে ভাইয়ের রোষ দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য সমুদ্রের পানিতে কাঠের পাত্রে ভাসিয়ে দিল পরিবারের অন্যরা। ছেলেটি ভাসতে ভাসতে গিয়ে থামল অজানা এক দ্বীপে। সেখানে কোনো মানুষ নেই, নেই কোনো হিংস্র জীবজন্তু। শিশু

সন্তানটি এক হরিণী মায়ের দুধপান করে বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে সেই দ্বীপের পশুকুলের সম্রাট হয়ে দাঁড়ালো সে। এমন সময় দু'জন লোক নির্জনে বসবাসের জন্য এই দ্বীপে এসে উপস্থিত হলো। তাদের সাথে তার পরিচয় হলো। তাকে তারা শেখালো মানুষের ভাষা। এরপর নিয়ে গেল মানব সমাজের মাঝে। কিন্তু সভ্য মানুষের কৃত্রিমতায় হাঁপিয়ে উঠল হাই ইবনে ইয়াকযান। সে তার সাথিদের নিয়ে আবার ফিরে এল সেই নির্জন দ্বীপে।

'হাই ইবনে ইয়াকযান'-এর কাহিনি রূপক হোক বা যে দার্শনিক তত্ত্বর মধ্যেই থাক না কেন, কাহিনি গঠন, সৌকর্য ও তার অভিনবত্বটুকু আমাদেরকে আকর্ষণ করে বেশি। এজন্য এটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আর এর প্রভাবের ফলে 'রবিনসন ক্রুসো' জাতীয় কাহিনির সৃষ্টি বলে কোনো কোনো গবেষক বলেছেন। আরবি গদ্য তথা কাহিনির জগতে 'হাই ইবনে ইয়াকযান'-এর অবদান তাই অনস্বীকার্য।

'রবিনসন ক্রুসো'র কাহিনি

রবিনসন ক্রুসো একজন প্রাণচঞ্চল তরুণ ও ভ্রমণপ্রিয় এক অভিযাত্রী। বাবা-মা চেয়েছিলেন ক্রুসো আইন পড়ে বড়ো আইনজীবী হবে। তা না শুনে নাবিক হতে চেয়েছিল সে। সমুদ্র তার খুব প্রিয়। বাবা-মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। সমুদ্র যাত্রায় সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ে কখনও বিধ্বস্ত হয় তাদের জাহাজ। আবার কখনো মাঝ সমুদ্রে পড়ে জলদস্যুদের কবলে। দুই বছর জাহাজে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করতে হয় তাকে। সেখান থেকে পালিয়ে মুক্তি পায় ক্রুসো।

কিন্তু আবারো সমুদ্রের টানে বেরিয়ে পড়ে। আবার সেই সামুদ্রিক ঝড়, আবার সেই জাহাজডুবির মতো ভয়ংকর ঘটনা। ডুবতে থাকা জাহাজ থেকে কাঠের টুকরো ধরে ভাসতে-ভাসতে একটি অজানা দ্বীপে পৌঁছায় সে। যাই হোক, সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিযান শুরু হয় যখন সে নিজেকে একটি নির্জন দ্বীপে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পায়।

নির্জন দ্বীপে নিজের আস্তানা গড়ে তোলে, ক্রুসো সপ্তাহের দিনগুলোতে দাগ দিত সময়ের হিসেব রাখার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করার জন্য। সংগ্রহে রাখা গমের দানা দিয়ে চাষাবাদের ব্যবস্থা করে ক্রুসো। পশুপালনের কাজেও লেগে পড়ে সে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে বসবাস করায় ক্রুসো শেখে কীভাবে নিজেকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করতে হয়। পরিস্থিতির কারণেই তাকে শিখতে হয়–খামার করা, পশুর চামড়া থেকে নিজের কাপড় তৈরি করা। অজানা দ্বীপটিকে নিজের করে তোলা। নিজেকে মনে করতে থাকে সে-ই দ্বীপের রাজা।

একদিন অজানা দ্বীপের সেই রাজা তার রাজ্যে দেখতে পেলেন মানুষের পায়ের ছাপ! নিজ রাজ্যে অন্য মানুষের উপস্থিতি তাকে আতঙ্কের মাঝে ফেলে দেয়। নিজের রাজা হওয়ার দম্ভে চিড় ধরে। দ্বীপের আগন্তুক নরখাদকদের ক্রমাগত আক্রমণ উপেক্ষা করে বেঁচে যায় সে। এই দ্বীপে পনেরো বছর অতিবাহিত করার পর ক্রুসো কিছু নরখাদক মানুষের সম্মুখীন হয়– যারা পার্শ্ববর্তী দ্বীপ থেকে এসেছিল। ক্রুসো তাদের এক কাছ এক বন্দিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। সে উদ্ধার করা বন্দির নাম দেয় ফ্রাইডে। শুক্রবারে দেখা হওয়ার কারণে তার নাম হয় 'ফ্রাইডে'। তাকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব নেয় সে। ধীরে ধীরে ফ্রাইডে তার বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে ওঠে। সবশেষে একটি জাহাজ এই দ্বীপে পৌঁছায় আর এতে চড়ে দীর্ঘ ২৮ বছরের একাকী জীবন কাটানোর পর ক্রুসো এবং তার সঙ্গী ফ্রাইডে ইংল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলে ফিরে আসে। মোটামুটি এরকমই 'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসের কাহিনি।

'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসের নায়ক এমনিভাবে জাহাজডুবির ফলে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে তাঁবু খাটানো, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আর অসভ্য মানুষকে দাসত্বে নিয়োগ, নরখাদক মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রভৃতি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সমাবেশে কাহিনিটি মনোরম। এই উপন্যাসে যেমন আছে কল্পনার চমৎকারিত্ব, তেমনি আছে বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক ছবি। বইটি বড়োদের জন্য লেখা হলেও

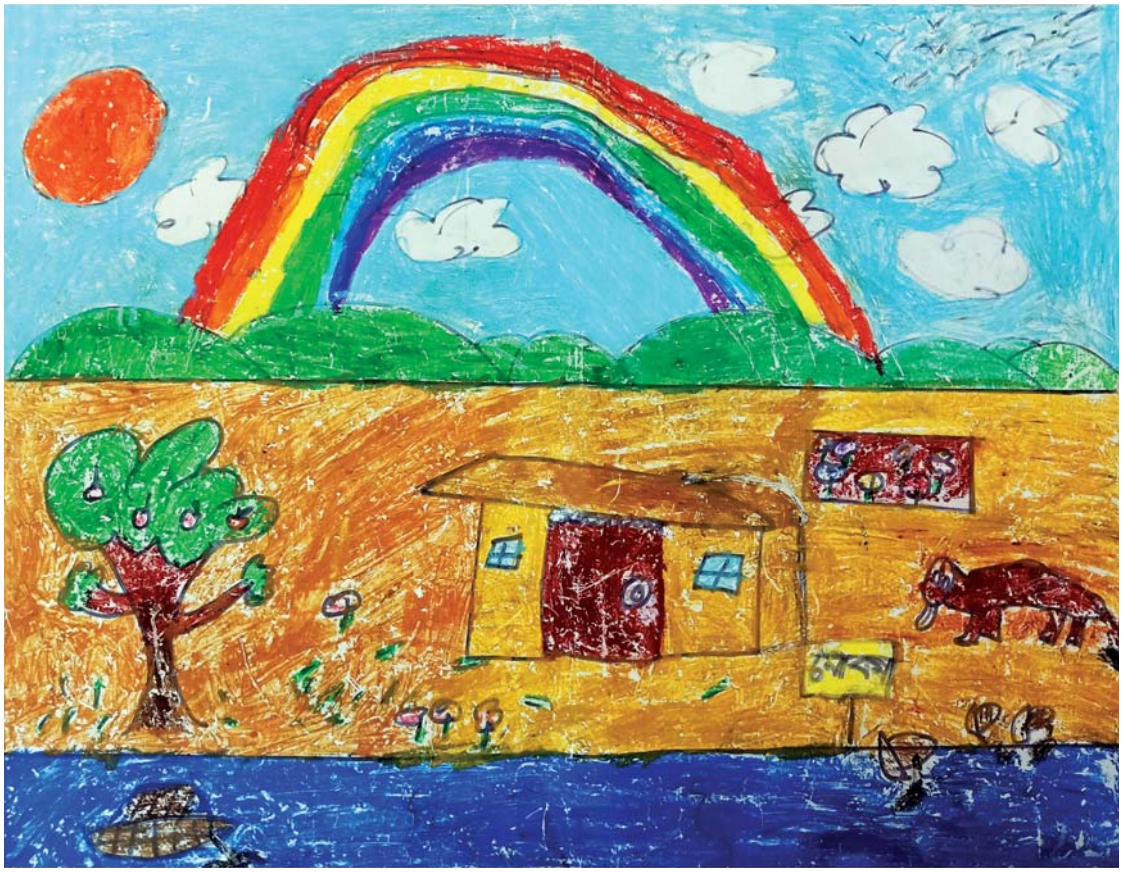

মাশরুর সাফির, তৃতীয় শ্রেণি, হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল,

পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোর-সাহিত্যেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসের বাস্তবতাবোধ ও জীবনচেতনা এই কাহিনিকে অসাধারণ মূল্য দিয়েছে নির্জন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে একাকী মানুষের জীবনকে ডিফো বিচিত্র কর্মধারায় অপরূপ করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রকাশের পরপরই 'রবিনসন ক্রুসো' বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। জাহাজডুবিতে নাবিক রবিনসন ক্রুসোর নির্জন দ্বীপে আশ্রয়ের কাহিনি নিয়ে তিনটি বই রচিত হয়। এই তিন খণ্ডের নাম–'দি লাইফ অ্যান্ড স্ট্রেনজ সারপ্রাইজিং অ্যাডভেঞ্চারস অফ রবিনসন ক্রুসো' (১৭১৯), 'ফাদার অ্যাডভেঞ্চারস' (১৭১৯) এবং 'অ্যাডভেঞ্চারস্ অফ রবিনসন ক্রুসো' (১৭২০)। মানুষের সংগ্রামের প্রতীক স্বরূপ রবিনসন ক্রুসো দীর্ঘ তিনশত বছর বিশ্বসাহিত্যে জ্বলজ্বল করছে।

১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল 'রবিনসন ক্রুসো' প্রকাশিত হয়। বইটির পুরো নাম– 'দি লাইফ অ্যান্ড স্ট্রেনজ সারপ্রাইজিং অ্যাডভেঞ্চারস অফ রবিনসন ক্রুসো', কিন্তু এই লম্বা নামটি লোকে ভুলে গিয়ে মনে রেখেছে শুধুমাত্র 'রবিনসন ক্রুসো'। উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত 'রবিনসন ক্রুসো'র সাতশো সংস্করণ, অনুবাদ এবং রূপান্তর হয়েছে। রবিনসন ক্রুসো বিশ্বের সব দেশের, সব যুগের, সব কালের কিশোর মনকে আলোড়িত করেছে, বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে। বইটি শিশু-কিশোর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ড্যানিয়েল ডিফোকে বিশ্বসাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বলা যেতে পারে। প্রকাশের সুদীর্ঘ ৩০০ বছর পেরিয়ে গেলেও 'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসের জনপ্রিয়তা আজও অম্লান। ■

এ যুগের ‘রবিনসন ক্রুসো’

শামীমা নাছরিন

জো লুকাস ৬৯ বছর বয়সি কানাডিয়ান। তাকে বলা হচ্ছে বর্তমান সময়ের ‘রবিনসন ক্রুসো’। গত ৪০ বছর ধরে পৃথিবীর অন্যতম দুর্গম দ্বীপে একাই বসবাস করে আসছেন তিনি। ‘স্যাবল আইসল্যান্ড’ নামে ওই দ্বীপটি প্রায় ২৬ মাইল লম্বা। সেখানে একাই ৪০ বছর পার করে ফেলেছেন জো। অবশ্য জো একা নন। সেখানে তার সঙ্গী ৪শত ঘোড়া, তিন লাখ গ্রে সিল ও প্রায় ৩শত প্রজাতির পাখি। কেমন লাগে এতবড়ো এই দ্বীপে একা থাকতে? প্রকৃতিপ্রেমী জো জানালেন, একা কোথায়? মানুষ হয়ত নেই কিন্তু তাতে কী ? হাজার হাজার প্রাণী আছে এই দ্বীপে। যা তাকে কখনো একাকী অনুভব করতে দেয় না। মন খারাপের ফুরসতই বা কোথায়। বেশিরভাগ সময় কাটে বাইনোকুলার হাতে নিয়ে দূরদূরান্তে প্রাণীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে। সাবেল আইসল্যান্ড থেকে মূল ভূখণ্ডে ফেরার একমাত্র উপায় বোট কিংবা চার্টার বিমান। কিন্তু এখানে এত ঘোড়া এল কোথা থেকে। জনশ্রুতি আছে ১৮শ শতকের দিকে এখানে কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন একদল মানুষ। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় তারা টিকতে পারেননি। উল্লেখ্য যে, বছরের প্রায় ১৩০ দিন সাবেল আইসল্যান্ড ধোয়ায় আচ্ছন্ন থাকে। তবে জো জানলেন এসবে সমস্যা নেই তার। তিনি বলেন, আমি দ্বীপজুড়ে শুধুই হাঁটি। ঘোড়ার প্রতি প্রেম থেকে আসলে আমি এখানে এসেছিলাম। আর ফেরা হয়নি। বর্তমানে বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করা গবেষকদেরও সহায়তা করছে জো লুকাস। ■

হলদে পাখির বাড়ি

সুলতানা লাবু

হলদে পাখি! ও হলদে পাখি। বাড়ি আছো?'

কোনো সাড়া নেই।

'তবে কী ও বাড়ি নেই? বাড়িতে ওর ছানারা থাকার কথা। ছানাদের রেখে কোথায় যেতে পারে?'

আবার হাঁক দিল শালিক- 'হলদে পাখি! ও হলদে পাখি। তুমি কি বাড়ি আছো?'

এই হিজল গাছেই তো ওর বাসা। কী সুন্দর বাসা বুনেছিল।

কিন্তু লতানো পরগাছায় হিজল গাছটা ঢেকে আছে। এতই ঢেকে আছে যে হলদে পাখির বাসাও দেখা যাচ্ছে না। অনেক উঁকিঝুঁকি মারল শালিক।

ওই তো পেয়েছি। ওই তো ওর বাসা দেখা যায়। কিন্তু এত চুপচাপ কেন? পরগাছার ফাঁক দিয়ে আবারো হাঁক দিল শালিক, 'হলদে পাখি! ও হলদে পাখি!'

তাহলে কি বাসা বদল করেছে হলদে পাখি? ভাবতে লাগল শালিক। অথচ কদিন আগেও হলদে পাখির এ বাসায় এসেছিল শালিক। তখন ও ডিমে তা দিচ্ছিল। ওর বাড়িতে তখন ঝলমলে আলো ছিল। ছিল ফুরফুরে বাতাস। অথচ এখন আলো নেই। বাতাস তো নেই-ই। এ বছর ফুলও ফোটেনি গাছটাতে। কী করে ফুটবে? হিজল গাছটা আলো পায় না। বাতাস পায় না। বৃষ্টির ফোঁটাও পড়ে না। পরগাছাটা একেবারে গিলে খেয়েছে ওকে। কিন্তু হলদে পাখি গেল কোথায়?

আবার ডাকল শালিক। 'হলদে পাখি! হলদে পাখি! ও হলদে পাখি!'

নাহ। এবারও কোনো সাড়া পেল না শালিক।

হিজলের পাশেই আকাশমনি গাছ। ওখানে কাঠবিড়ালির বাসা।

কাঠবিড়ালিকে ডাকল শালিক। 'কাঠবিড়ালি, ও কাঠবিড়ালি!'

ডাক পেয়েই ছুটে এল কাঠবিড়ালি। লেজ উঁচিয়ে বেরিয়ে এল বাসা থেকে। এসেই গরম গলায় শালিককে বলল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো। সেই তখন থেকে হলদে পাখি, হলদে পাখি বলে চেঁচিয়েই যাচ্ছ। এখন আবার কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি বলে চেঁচাচ্ছো। কী হয়েছে তোমার?'

জানতে চাইল শালিক, 'হলদে পাখি কোথায় গেছে?'

'হলদে পাখিকে আবার কী দরকার?'

শালিক বলল, 'ওর ছানাদের দেখতে এসেছি। অনেক ডাকাডাকি করছি। কিন্তু সাড়া নেই। তাই তোমাকে ডেকেছি। কোথায় গেছে হলদে পাখি? জানো কিছু?'

এবার নরম হলো কাঠবিড়ালি। বলল, 'আমিও ক'দিন ধরে কিচিরমিচির শুনছি না। বাসা বদল করেছে হয়ত। বদলানো ছাড়া উপায়ও ছিল না। হিজল গাছটার কী দশা হয়েছে দেখেছ? পরগাছায় একেবারে ছেয়ে আছে।'

এবার ভালো মতো তাকালো শালিক। পরগাছাটার পাতাগুলো বেশ সবুজ। চকচকে। সাদা সাদা ফুলও ফুটেছে। কী নাম এই পরগাছার কে জানে।

মনটাই খারাপ হয়ে গেল শালিকের। হলদে পাখির সঙ্গে দেখা হলো না। ওর ছানাদেরও দেখা হলো না।

কাঠবিড়ালিও ভাবনায় পড়ে গেল। কপাল কুঁচকে বলল, 'গেল কোথায় ওরা?

ওই তো সামনেই টিয়ার বাড়ি। ওই জারুল গাছে। দেখো ওরা কিছু জানে কী না।'

এবার শালিক ছুটল জারুল গাছের দিকে। আর জারুল গাছে এসেই হইহই করে উঠল শালিক, 'পেয়েছি। ওই তো হলদে পাখি। ওই তো ওর তিনটে ছানা। ছানাদের সাথে ওড়াওড়ি খেলছে।'

শালিককে দেখে হলদে পাখিও খুব খুশি হলো। বলল, 'আরে শালিক পাখি। তুমি এখানে?'

শালিক বলল, 'তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম। তুমি বাড়ি ছিলে না। তাই টিয়ার বাড়ি যাচ্ছিলাম তোমার খবর নিতে। জারুলের ডালে বাসা বুনেছ দেখছি। বাসা বদল করেছ কেন? ওটা তো তোমার প্রিয় বাসা ছিল।'

হলদে পাখি বলল, 'উপায় ছিল না বন্ধু। ওই বাসায় এখন আলো নেই। বাতাসও নেই।'

শালিক বলল, 'প্রিয় বাসায় ফিরে যেতে চাও?'

'খুব চাই। প্রিয় বাসাটার কথা খুব মনে পড়ে। কিন্তু...'

'চলো তাহলে আগের বাসায়।'

'কিন্তু ওখানে যে আলো নেই। বাতাস নেই।'

শালিক বলল, 'যদি তোমার বাড়িতে আলো এনে দেই। বাতাস এনে দেই?'

অবাক হলো হলদে পাখি। বলল, 'কিন্তু সেটা কেমন করে হবে? হিজলের মাথার উপর পরগাছাটা একেবারে চেপে বসেছে।'

শালিক বলল, 'দেখই না।' বলেই শালিক ছুটল। হিজল গাছের কাছে এসে আরো অনেক শালিককে ডাকল। তারপর সব শালিক মিলে কাজে নামল।

পরগাছার লতাপাতা সরাল ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে। টিয়ার দলও এগিয়ে এল। ধারালো ঠোঁট দিয়ে টিয়া-রা কাটল পরগাছার লতাগুলো। কাঠবিড়ালিও ছুটে এল তার ছানাপোনা নিয়ে। সবাই মিলে পরগাছা পরিষ্কার করে ফেলল। আরো কিছুক্ষণ পর হিজল গাছের মাথাটা উঁকি দিল আকাশে। মাথায় একটাও পরগাছা নেই।

ওই তো হলদে পাখির বাসাটা দেখা যায়। কী সুন্দর বাসা। জারুল গাছ থেকে ছানাদের নিয়ে নিজের প্রিয় বাসায় ফিরে এল হলদে পাখি। বাসাটায় এখন আগের মতো আলো আছে। বাতাস আছে। প্রিয় বাসায় এসে খুব খুশি হলো হলদে পাখি। খুশি হলো হলদে পাখির ছানারাও। হলদে পাখির মতো পড়শি পেয়ে কাঠবিড়ালিও খুশি হলো। আর খুশি হলো হিজল গাছ।

হিজলটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। পরগাছার কারণে ওর দম যেন আটকে আসছিল।

কিছুদিন পর...

আলোর ফাঁক দিয়ে ডালপালা ছড়ালো হিজল।

বর্ষা এল। হিজলের ডালগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল।

কদিন পর শালিকরাও এসে বাসা বুনতে লাগল হিজলের ডালে। এত সুন্দর গাছে বাসা না বুনে থাকা যায়? ■

রিজওয়ান আল রাহাত (ইনান), জুনিয়র ওয়ান, চিলড্রেন একাডেমি, হাজিগঞ্জ চাঁদপুর

আকাশের সীমা ছাড়িয়ে

সানাউল্লাহ আল-মুবীন

রুশ দেশের এক বিজ্ঞানী নাম কনস্তানতিন সিওলকোভস্কি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বলেছিলেন, পৃথিবী হলো মানুষের সভ্যতার আঁতুড় ঘর। কিন্তু আঁতুড় ঘরে কেউ চিরকাল বন্দি হয়ে থাকতে পারে না। পৃথিবী আমাদের এক পরম মমতায় বেঁধে রেখেছে, যে শক্তির বল-এ সে আমাদের তার শরীরের সঙ্গে ধরে রেখেছে, তার নাম অভিকর্ষ। এই শক্তির টানে গাছ থেকে আপেল ফল মাটিতে পড়ে। ওপর দিকে কোনো ঢিল ছুঁড়ে মারলে খানিক পরেই তা আবার মাটিতে নেমে আসে। এমনকি দূর আকাশের মায়াবি চাঁদকেও পৃথিবী তার চারপাশে ঘোরায় এই শক্তির জোরে। এই বলের বৈশ্বিক নাম মহাকর্ষ। সতেরো শতকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন প্রথম এই বলের ধারণা দেন। তাঁর সূত্রমতে কেবল পৃথিবীই নয়, মহাবিশ্বের সকল বস্তু এই আশ্চর্য বলের অধিকারী।

নিউটন নানা জটিল হিসাব-নিকাশ করে এও দেখিয়েছিলেন যে, কোনো বস্তুকে যদি ঘণ্টায় ত্রিশ হাজার কিলোমিটারের কাছাকাছি বেগে আকাশের দিকে ছোঁড়া যায়, তবে সেই বস্তু আর কোনোদিনই মাটিতে ফিরে আসবে না। নির্দিষ্ট উঁচুতে থেকে ঘুরবে পৃথিবীর চারপাশে। ঠিক যেমন ঘোরে পৃথিবীর চারপাশে চাঁদ, কিংবা সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ। এই বেগকে বলা হয় চক্করবেগ। আর পৃথিবীর মায়ার বাঁধন একেবারে কাটিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে বেগ হওয়া চাই আরো বেশি – ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার। একে বলা হয় পলাতকবেগ। নিউটনের সময় এসব অবশ্য ছিল নিতান্তই অঙ্কের হিসেব। কারণ তখন মানুষের হাতে সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় মাত্র পাঁচশত কিলোমিটার।

ষোলো শতকের শেষ দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়োহানেস কেপলার তাঁর কল্পকাহিনি *স্বপ্ন*-তে নায়ক ডুরাকোটাসকে এক প্রেতের সাহায্যে চাঁদে পৌঁছে দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিখ্যাত ফরাসি কল্পকাহিনি লেখক জুলভার্ন তাঁর *পৃথিবী থেকে চাঁদে* বইয়ে তিনজন নভোচারীকে কামানের গোলার সাহায্যে চাঁদে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের পৃথিবী থেকে চাঁদে পাঠিয়েছিলেন সঠিকভাবেই, ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার বেগে।

এ তো গেল কল্পকাহিনির কথা। আজ আমরা জানি, কেবল চাঁদের দেশেই নয়, মানুষের অনুসন্ধানী দৃষ্টি এখন প্রসারিত দূর আকাশের দীপ্তিমান তারার জগতেও। অত্যাধুনিক গ্রহতরি পাঠিয়েছে শুক্র ও মঙ্গলের দেশে। তার পাঠানো ভয়েজার আকাশতরি এখন সৌরজগতের সীমা ছাড়িয়ে অবিরাম ছুটে চলেছে অনন্ত নক্ষত্রবীথির পথে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে, আকাশ সমুদ্রে প্রথম পাল তুলেছিল স্পুতনিক নামের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে এটি উড়িয়েছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। পরের মাসেই লাইকা নামের একটি কুকুরসহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে দ্বিতীয় স্পুতনিক। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে মানুষের দূত হিসেবে চাঁদের দেশে গিয়ে হাজির হয়েছিল সোভিয়েতের তৈরি লুনিক-২ নামের চন্দ্রতরী। তার দেড় বছর পর – ১৯৬১ সালের এপ্রিলে সত্যি সত্যিই মানুষ মহাকাশে উড়াল দেয়। ভস্তক-১ নামের একটি আকাশ তরীতে চেপে মাত্র দেড় ঘণ্টায় পৃথিবীর চারপাশ একবার ঘুরে আসে ইউরিগাগারিন নামের এক দুঃসাহসী রুশ যুবক, ইতিহাসে সে নিজের নাম লেখায় আকাশ সমুদ্রের প্রথম নাবিক হিসেবে। মাটি থেকে তার আকাশ খেয়ার উড়াল পথের গড় উচ্চতা ছিল দু-শো কিলোমিটারেরও বেশি।

প্রথম মার্কিন নভোচারী মহাকাশে ওড়ে ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। জন গ্লেন নামের এই যুবক মার্কারি প্রকল্পের অধীন ফ্রেন্ডশীপ-৭ নামক আকাশ তরীতে চড়ে পাঁচ ঘণ্টায় তিনবার পৃথিবী পাক খেয়ে আসে। পৃথিবী থেকে তার উড়াল পথের সর্বোচ্চ দূরত্ব ছিল সোয়া দু-শো কিলোমিটার। প্রথম মহিলা নভোচারী আকাশে উড়াল দেয় ১৯৬৩ সালের জুনে। ভালেন্তি তেরেশকোভা নামের এই রুশ তরুণী ভোস্তক-৬ আকাশ খেয়ায় চড়ে তিনদিন ধরে পাক খায় পৃথিবীর চারপাশ। ১৯৬৫ সালের মার্চে রুশ নভোচারী আলেক্সি লিওনভ যান থেকে বেরিয়ে মহাকাশে দশ মিনিট ধরে সাঁতরে বেড়ায়। এটি ছিল মহাকাশে মানুষের প্রথম সঞ্চরণ।

এরপর বহু মার্কিন ও সোভিয়েত অভিযাত্রী মহাকাশে উড়েছে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। কিন্তু পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেই কি মানুষ সন্তুষ্ট থাকবে? না, এবার তার অভিযাত্রা চাঁদের দিকে। সোভিয়েতরা অবশ্য চাঁদে মহাকাশযান পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল তাদের চন্দ্রপ্রকল্প। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাঁদে সশরীরে মানুষ পাঠানোর একটি বড়ো প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পটির নাম অ্যাপোলো। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েকজন নভোচারী ১৯৬৮ সালের বড়োদিন কাটায় মাত্র একশ কিলোমিটার দূর দিয়ে চাঁদের চারপাশে চক্কর দিতে দিতে। পরের বছর একজন নভোচারী মূল আকাশ তরী থেকে আলাদা হয়ে চন্দ্র তরী নিয়ে পৌঁছায় চাঁদের মাটির মাত্র পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে। তারপর এল সেই ঐতিহাসিক ২১শে জুলাই ১৯৬৯। এদিন অ্যাপোলো ১১-এর অভিযাত্রী নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন চন্দ্র তরী ঈগল নিয়ে গিয়ে নামল চাঁদের মাটিতে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের পদচিহ্ন আঁকা পড়ল পৃথিবী থেকে প্রায় চার লাখ কিলোমিটার দূরের এক জগতে।

আমাদের পূর্বপুরুষ প্রথম যখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার একটি পদচিহ্ন রেখে গিয়েছিল আফ্রিকার তানজানিয়ায়, আগ্নেয়গিরি থেকে উপচেপড়া লাভার নরম কাদায়। ১৯৭৯ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে সেই আদি মানবের পায়ের ছাপ। প্রায় ত্রিশ লাখ বছর পরে আজ মানুষ আর একটি পায়ের ছাপ রাখল প্রায় চার লাখ কিলোমিটার দূরে, চাঁদের ধূসর মাটিতে। ত্রিশ লাখ বছর আগেকার সেই পায়ের ছাপকে যদি বলা যায় মানুষের অভিযাত্রার শৈশবের, তবে আজকের ছাপটিকে বলতে হয় তার তারুণ্যের, যা সে রাখল অন্য কোনো জগতে হাঁটবে বলে।

চাঁদের মাটিতে পা রাখা ছিল মানুষের ইতিহাসের এক বিশাল ঘটনা। এই প্রকল্পের অধীনে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ আরো পাঁচবার গিয়ে নেমেছে তাকে চিরকাল হাতছানি দিয়ে ডাকা চাঁদের পিঠে। ইতোমধ্যে মহাকাশে দিনের পর দিন কাটানোর চিন্তাও করে সে। এই লক্ষ্যে ১৯৬৭ ও ৬৮ সালে আকাশে পাল তোলে সায়ুজ-১, ২ ও ৩ নামে সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনটি নভোযান। ১৯৬৯ সালে আকাশে ওঠে সায়ুজ-৪ ও ৫। এ দুটো খেয়াযান পাশাপাশি ভাসতে ভাসতে একসময় জোড়া লাগে। এক খেয়ার নাবিক গিয়ে ঢোকে অন্য খেয়ায়।

সোভিয়েতরা ১৯৭১ সালে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করে সালুত নামের প্রথম মহাকাশ-স্টেশন। সায়ুজ-১১ তে চড়ে ওই স্টেশনে প্রথমে তিনজন আকাশচর কাটায় চব্বিশ দিন। সেটি ছিল মহাকাশে মানুষের প্রথম ঘরপাতা। এরপর ওই শ্রেণির আরো স্টেশন বানানো হয়। সেসব স্টেশনে যাওয়া-আসা করে প্রায় বিশ দল আকাশ নাবিক। ১৯৮৬ সালে একদল আকাশচর সেখানে একনাগাড়ে কাটিয়ে আসে এক বছরেরও বেশি

সময়। এভাবে শুরু হয় মহাকাশে মানুষের দীর্ঘকাল অবস্থান করে গবেষণার কাজ। এদিকে, ১৯৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আকাশে ভাসায় স্কাইল্যাব নামে বিশাল গবেষণা-জাহাজ। অ্যাপোলোতে চড়ে প্রথমে তিন জন সেখানে প্রায় এক মাস কাটিয়ে আসে। দ্বিতীয় দল কাটায় দু-মাস, তৃতীয় দল তিন মাসের কাছাকাছি। ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত সায়ুজ যানের সঙ্গে মহাকাশে জোড়া লাগে মার্কিন যান অ্যাপোলো। এ সময় মার্কিন নভশ্চর টমাস স্টফোর্ড ও ডোনাল্ড স্লেটন গিয়ে ঢোকে সায়ুজে। সেখানে সোভিয়েত নভশ্চর আলেক্সি লিওনভ ও ভালেরি কুবাসভ তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তারা সেখানে মার্কিন ও সোভিয়েত পতাকা বিনিময় করে। একইভাবে লিওনভ ও ভালেরি গিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটায় অ্যাপোলোতে। ১৯৮১ সাল থেকে মার্কিনরা মহাকাশে পাঠাতে শুরু করে কলাম্বিয়া, ডিসকভারি, চ্যালেঞ্জার, আটলান্টিস, এনডেবার প্রভৃতি শাটলতরী। এসব আকাশফেরি বহুবার যাতায়াত করেছে পৃথিবী থেকে আকাশে, আকাশ থেকে পৃথিবীতে। ১৯৯০ সালে শাটল মহাকাশে বয়ে নিয়ে গেছে বিশাল হাবল দুরবিন। এর সাহায্যে মানুষ আজ প্রায় দেড়-হাজার কোটি আলোক বছর দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহের দিকে প্রথম আকাশ তরী পাঠান মহাকাশ যুগের একেবারে গোড়ার দিকে, ১৯৬১ সালে। ভেনাস-১ নামের সেই সোভিয়েত গ্রহতরি উড়ে গিয়েছিল শুক্রের পাশ দিয়ে। ১৯৬২ সালে একইভাবে শুক্রের পাশ দিয়ে উড়ে যায় মার্কিন গ্রহতরি মেরিনার-২। ১৯৬৭ সালে ভেনাস-৪ নামের সোভিয়েত গ্রহতরি যন্ত্রপাতি ভরা আঁধার নামিয়ে দিয়েছিল শুক্রের আবহমণ্ডলে। এরপর আরো ভেনাস ও মেরিনার যান গিয়ে হাজির হয়েছিল শুক্রের দেশে। ১৯৭৫ সালে শুক্রের বন্দরে নোঙর ফেলে ভেনাস-৯ ও ভেনাস-১০। এ দুটো গ্রহ যান হয়ে ওঠে শুক্র গ্রহের দুটো কৃত্রিম উপগ্রহ। ১৯৭৮ সালে এভাবে শুক্রের তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে ওঠে মার্কিন গ্রহতরি পাইয়োরিয়ার-১২।

মঙ্গল গ্রহের দেশে প্রথম যে গ্রহতরি গিয়ে পৌঁছোয় সেটি মেরিনার-৪। এই মার্কিন গ্রহযান মঙ্গলের পাশ দিয়ে উড়ে গিয়েছিল ১৯৬৫ সালে। এরপর আরো মেরিনার নৌকো ভাসে মঙ্গলের দিকে। কয়েকটি বেরিয়ে যায় তার পাশ কাটিয়ে। একটি নোঙর ফেলে: মেরিনার-৯। ১৯৭৬ সালে মঙ্গলের বন্দরে গিয়ে ভেড়ে মার্কিন গ্রহতরি ভাইকিং-১ ও ভাইকিং-২। এরা কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে মঙ্গলের পিঠে নামিয়ে দেয় যন্ত্রপাতির আধার। ১৯৯৭ ও ২০১২ সালে মঙ্গলের পিঠে অবতরণ করে মার্কিন আকাশতরি পাথ-ফাইন্ডার ও কিউরিওসিটি। ২০১৪ সালে মঙ্গলের বন্দরে গিয়ে ভেড়ে প্রথম ভারতীয় গ্রহ যান।

শুক্র ও মঙ্গল আমাদের গ্রহপাড়ার দুই পড়শি। কেবল এ দুটো গ্রহে নভোযান পাঠিয়েই মানুষ থেমে থাকেনি। চাই আরো দূরের অভিযাত্রা। ১৯৯৫ সালে দূরের গ্রহ বৃহস্পতিতে গিয়ে পৌঁছে মার্কিন গ্রহতরি গ্যালিলিও। ২০০৪ সালে শনির দেশে গিয়ে হাজির হয় ক্যাসিনি। পরের বছর এটি অবতরণ যান হাইগেন্‌সকে সফলভাবে নামিয়ে দেয় তার উপগ্রহ টাইটানে। ২০১৭ সালে তার কাজ শেষ করে বিজ্ঞানীদের

নির্দেশ মতো শনির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে এই গ্রহতরি।

১৯৮৫ সালে পৃথিবীর আকাশে উদিত হয়েছিল বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতু। সেই ধূমকেতুর খবরাখবর নেওয়ার জন্য তখন আকাশে উঠেছিল ভেগা-১ ও ভেগা-২ নামের দুটো সোভিয়েত আকাশযান। ২০১৪ সালে ইউরোপীয় মহাকাশতরি রোজেটা থেকে এমনই এক ধূমকেতুর পিঠে আলতোভাবে অবতরণ করে ফিলি নামের এক অনুসন্ধানী যান।

মহাকাশে সবচেয়ে দূরের অভিযাত্রা করে ভয়েজার-১ ও ভয়েজার-২ নামের দুটো অন্তর্নক্ষত্র মহাকাশফেরি। এ দুটো অভিযাত্রী যান মহাকাশে ডানা মেলে ১৯৭৭ সালে। পরের বছরই এরা পেরিয়ে যায় মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ ও গ্রহাণুদের এলাকা। অন্য কোনো নভোযান এর আগে এই এলাকা পার হয়নি। উড্ডয়নের প্রায় দেড় বছর পর, ১৯৭৯ সালে এরা ঢোকে বৃহস্পতির দেশে। এ সময় সৌরজগতের বাইরের দিকের বড়ো গ্রহগুলোর এক বিরল যোগাযোগের ঘটনা ঘটছিল। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন এসে পড়ছিল একটা প্রায় বৃত্তচাপের মতো বাঁকানো রেখায়। এমন যোগাযোগ ঘটে পৌনে দু-শো বছর সময়ের মধ্যে মাত্র একবার। এই সুযোগ কাজে লাগানো গেলে আর মাত্র দশ বছরের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে সৌরজগতের সবচেয়ে দূরের গ্রহ নেপচুনে। যে গতিবেগে ভয়েজার ছুটে চলছিল, তাতে অন্য সময় সেখানে পৌঁছাতে সময় লাগত প্রায় তিরিশ বছর। ভয়েজারের অভিযান পরিচালনাকারী বিজ্ঞানীদল কাজে লাগালেন এই সুযোগ। তারা বৃহস্পতির মহাকর্ষের বিপুল টান কাজে লাগিয়ে ভয়েজারকে ঠেলে দিলেন শনির দিকে, শনির টান কাজে লাগিয়ে ইউরেনাসের দিকে এবং ইউরেনাসের টান কাজে লাগিয়ে নেপচুনের দিকে।

ভয়েজার-১ শনিব্যবস্থায় ঢোকে ১৯৮০ সালে। ইউরেনাস ও নেপচুনগ্রহ কক্ষপথে তখনো বেশ পেছনে। সুতরাং-ভয়েজার-১ এ দুটো গ্রহের নাগাল পায়নি। শনির জগৎ পেরিয়ে এটি ছুটে চলল সৌরজগতের বাইরের দিকে, অনন্ত নক্ষত্রবীথির পথে। ভয়েজার-২ শনির দেশে পৌঁছায় ১৯৮১ সালে। তার প্রচণ্ড টানের জোর তাকে বিপুল বেগে ঠেলে দেয় পরের গ্রহ ইউরেনাসের দিকে। মাত্র চার বছর পরে, ১৯৮৬ সালে, এই অভিযাত্রী যান পৌঁছে যায় শনির দ্বিগুণ দূরের গ্রহ ইউরেনাসে। এখান থেকে আরো তিন বছরের পথ পেরিয়ে, উড্ডয়নের প্রায় এক যুগ পরে, ১৯৮৯ সালে এটি গিয়ে হাজির হয় সৌরজগতের দূরতম গ্রহ নেপচুনে। এরপর পুরো সৌরজগতের একটি ছবি তুলে পাঠিয়েছে এই নভোযান। ২০১৩ সালে এটি ডিঙিয়ে গেছে সৌরজগতের প্রান্তসীমা।

ভয়েজাররা এখন পর্যন্ত পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া সবচেয়ে দ্রুতগতির মহাকাশযান। অন্তর্নক্ষত্র শূন্যস্থান দিয়ে এরা এখন ঘণ্টায় দশ লাখ কিলোমিটারেরও বেশি বেগে ছুটে চলেছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি পানে। এমন প্রচণ্ড বেগে ছুটেও আমাদের তারা পাড়ার সবচেয়ে কাছের পড়শি প্রকজিমা সেনটৌরির দূরত্ব অতিক্রম করতে এদের লেগে যাবে চল্লিশ হাজার বছরেরও বেশি সময়। এই অন্তর্নক্ষত্র মহাকাশতরি দুটো ২০২০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে বলে আশা করা যায়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এক লাখ বছরের মধ্যেই এরা উড়ে যাবে আমাদের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের পাশ দিয়ে এবং শখানেক কোটি বছরের মধ্যে হয়ত প্রথমবারের মতো ঘোরা শেষ করবে ছায়াপথের ভারী কেন্দ্রের চারপাশ।

ভয়েজার নভোযান তার বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় রচিত শুভেচ্ছাবাণী। শিশুর কান্নার আওয়াজ, বিভিন্ন প্রাণীর ডাক, নানা ভাষার বেশ কিছু গান, কিছু ভিডিও আর ছবি। সে নভোযান যদি কোনোদিন আকাশের দূর সীমা ছাড়িয়ে, সূর্যের মতো অন্য কোনো তারার চারপাশে ঘূর্ণনশীল, পৃথিবীর মতো বসতিময় কোনো গ্রহে গিয়ে হাজির হয়, আর সেখানকার বুদ্ধিমান প্রাণীরা যদি তার পাঠ উদ্ধার করতে পারে, তবে সেদিন তারা জানবে, মহাবিশ্বে পৃথিবী নামের একটি গ্রহেও একদিন ফুটেছিল প্রাণের মুকুল, সেই প্রাণ বিকশিত হয়েছিল, শেষে উদ্ভব ঘটেছিল মানুষ নামের এক মেধাবী প্রজাতির। যে সভ্যতা গড়েছিল; ভাষা আবিষ্কার করেছিল, কবিতা ও গান লিখেছিল; সৃষ্টি করেছিল শিল্পকলা; উদ্ভাবন করেছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; নাও ভাসিয়েছিল তারার দ্বীপের পানে, খুলতে চেয়েছিল বিশ্বরহস্যের ঝাঁপি, জানতে চেয়েছিল মহাবিশ্বের অন্য কোনো প্রান্তে সে ছাড়া অন্য কোনো মেধাবী প্রাণরূপের বিকাশ ঘটেছে কি না। ■

অংক নাকি অঙ্ক
মংগল নাকি মঙ্গল

তারিক মনজুর

বিকালবেলা। মাঠে সবাই খেলছিল। আর পিলটু মন খারাপ করে গাছতলায় বসেছিল। আজ স্কুলে 'মঙ্গল' বানান অনুস্বার দিয়ে সে লিখেছিল মংগল। আর স্যার সেটা কেটে দিয়েছেন।

ভাষা-দাদু গাছতলায় পিলটুকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'কী হয়েছে, পিলটু? সবাই খেলছে। তুমি বসে আছ কেন?'

ভাষা-দাদুকে দেখে পিলটুর ভালো লাগল। সে কোনো ভূমিকা না করেই বলল, 'আচ্ছা, দাদু, মঙ্গল বানানে ং দিয়ে লিখলে কী সমস্যা?'

ভাষা-দাদু বললেন, 'সমস্যাটা উচ্চারণের নয়। সমস্যাটা বানানের। মঙ্গল লিখতে গেলে ঙ দিতে হবে।'

'কিন্তু অনুস্বার কি ভুল?' পিলটু জানতে চায়।

'হ্যাঁ, বানানের জন্য ভুল। একইভাবে অঙ্ক বানান। ং দিয়ে অংক লিখলে ভুল হবে।'

পিলটু অবাক হয়ে তাকায়, 'কিন্তু, দাদু, অঙ্ক বানান তো আমি সবসময় ং দিয়ে লিখি।'

'শুধু তুমি না, অনেকেই অঙ্ক বানান ং দিয়ে লেখে। অনুস্বার দিয়ে লিখলে ভুল হবে।'

'কিন্তু কেন?' পিলটু জানতে চায়।

ভাষা-দাদু হাতের লাঠিটা গাছের গায়ে ঠেকিয়ে রাখলেন। তারপর পিলটুর পাশে বসে পড়লেন।

বললেন, 'বুঝেছি, আমার কথা পুরোপুরি বুঝতে পারোনি। আচ্ছা বোঝাচ্ছি।' এই বলে তিনি ব্যাগ থেকে কাগজ আর কলম বের করলেন। বললেন, 'এখানে ক থেকে ম পর্যন্ত লেখ দেখি!'

পিলটু এবার আরও অবাক হয়। বলল, 'এ তো সবাই পারে!' এরপর খসখস করে লিখতে শুরু করল। ওকে লিখতে দেখে নেহা এগিয়ে আসে। খাতায় ক খ গ ঘ লেখা দেখে বলল, 'ভাষা-দাদু, পিলটুকে কি হাতের লেখা শেখাচ্ছ?'

ভাষা-দাদু হাসলেন। বললেন, 'এর চেয়েও মজার জিনিস শেখাচ্ছি। ... তুমিও বসো না পাশে!'

নেহাও পাশে বসে পড়ল। দেখল, পিলটু কাগজে লিখেছে –

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম

এই যে দাদু, লেখা শেষ! পিলটু খাতা ও কলম ভাষা-দাদুর দিকে এগিয়ে দেয়।

দাদু এবার দুজনের উদ্দেশে বললেন, প্রত্যেক লাইনের শেষ বর্ণের দিকে তাকাও। কী দেখতে পাচ্ছ?

নেহাই আগে উত্তর দিল। বলল, 'দেখতে পাচ্ছি ঙ ঞ ণ ন ম।'

পিলটু বলল, 'কিন্তু ওসব বর্ণের দিকে তাকাতে হবে কেন?'

'বলছি কেন।' ভাষা-দাদু ঙ ঞ ণ ন আর ম-এর চারপাশে গোল গোল করে দাগ দিলেন। বললেন, 'বানানে যুক্তবর্ণের একটা ঐক্য আছে।'

এবার নেহাও একটু অবাক হয়। ছোটোবেলা থেকেই যুক্তবর্ণ দেখছে সে। তবে যুক্তবর্ণের ঐক্যের কথা আগে শোনেনি। নেহা বলল, 'যুক্তবর্ণের ঐক্যের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

দাদু এবার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, 'ক খ গ ঘ – এগুলোর আগে হয় ঙ। যেমন, অঙ্ক বানানে ক-এর আগে ঙ। শঙ্খ বানানে খ-এর আগে ঙ। মঙ্গল বানানে গ-এর আগে ঙ। সঙ্ঘ বানানে ঘ-এর আগে ঙ।'

নেহা বলল, 'বাহ! মজা তো!'

'কিন্তু, দাদু, তুমি ক থেকে ম পর্যন্ত লেখালে কেন? ক থেকে ঙ পর্যন্ত লেখালেই তো পারতে।' পিলটু বলে।

'এখনই তো আসল মজা দেখতে পাবে। দ্বিতীয় লাইনে আছে চ ছ জ ঝ। এগুলোর আগে হবে ঞ। যেমন, চঞ্চল বানানে চ-এর আগে ঞ। লাঞ্ছনা বানানে ছ-এর আগে ঞ। গঞ্জ বানানে জ-এর আগে ঞ। আর ঝঞ্ঝা বানানে ঝ-এর আগে ঞ।'

'তাহলে, দাদু, ট-এর লাইনেও কি একই নিয়ম?' নেহা একটু উত্তেজনা বোধ করছে।

'হ্যাঁ, ট-এর লাইনেও একই নিয়ম।' ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'ট ঠ ড ঢ এসব বর্ণের আগে হবে মূর্ধন্য-ণ। যেমন, কণ্টক বানানে ট-এর আগে ণ। কণ্ঠ বানানে ঠ-এর আগে ণ। কাণ্ড বানানে ড-এর আগে ণ – এরকম।'

নেহা বলল, 'আমি বুঝে গেছি। তার মানে ত থ দ ধ – এগুলোর আগে হবে দন্ত-ন। তাই না?'

ভাষা-দাদু ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক তাই! যে কারণে দন্ত বানানে ত-এর আগে হয় ন। পান্থ বানানে থ-এর আগে হয় ন। মন্দ বানানে দ-এর আগে হয় ন। বন্ধ বানানে ধ-এর আগে হয় ন।'

পিলটু বলল, 'দাদু, আমিও বুঝে গেছি। প ফ ব ভ-এর আগে ম হবে।'

ভাষা-দাদু বললেন, 'হ্যাঁ। প ফ ব ভ-এর আগে ম হবে। কম্পন বানানে তাকিয়ে দেখ, প-এর আগে ম। লম্ফ বানানে ফ-এর আগে ম। লম্ব বানানে ব-এর আগে ম। একইভাবে কুম্ভ বানানে –'

দাদুর কথা শেষ হওয়ার আগেই দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'ভ-এর আগে ম!'

ভাষা-দাদু খাতা-কলম ঝোলায় ভরলেন। বললেন, 'অনেক হয়েছে। ... যাই তবে।' এই বলে লাঠি ভর করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

ভাষা-দাদুর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নেহা বলল, 'যুক্তবর্ণের তাহলে ঐক্য আছে!'

পিলটু খুশি খুশি গলায় বলল, 'আমারও আর এইসব যুক্তবর্ণে কখনো ভুল হবে না।' ■

গল্প

পিঁপড়া ও অহংকারী হাতি

কৌশিক সূত্রধর

এক বনে বাস করত বিশাল একটি হাতি। হাতিটা যেমন ছিল উঁচু তেমন ছিল তার গায়ের জোর। সে তার শক্তির উপর অনেক অহংকার করত। সে ভাবত এই বনে তার চেয়ে শক্তিশালী প্রাণী আর দুটো নেই। এই বলে হাতিটা প্রায়সই অট্টহাসি হাসত আর বনের অন্যান্য প্রাণীরাও তাই মেনে নিত। তারা সবসময় বলত.. সত্যি তো হাতির মতো শক্তিশালী প্রাণী এই বনে আর কে আছে। এই বলে বনের প্রাণীরা হাতিকে বাহবা দিত। এইভাবে চলে যায় কিছুদিন। একদিন হাতিটার হঠাৎ প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগে যাওয়ায় সে খাবার খুঁজতে বনের একটু গভীরে চলে গেল। সে বনের গভীরে গিয়ে একটি কলা গাছ দেখতে পেয়ে তা খাওয়ার জন্য গাছটির দিকে এগিয়ে গেল। হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে কলা গাছটিকে উপড়ে ফেলতে যাবে এমন সময় সে দেখতে পেল কলা গাছটির পাতার মধ্যে একটি পিঁপড়া। পিঁপড়াটি কোথা থেকে যেন একটা ছোটো মিষ্টির টুকরো তার মুখে করে নিয়ে কলা গাছের পাতার মধ্যে হাঁটছে। পিঁপড়াটার মিষ্টির টুকরোটি বহন করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তাই দেখে হাতিটা বলল.. কি হে পিঁপড়া বন্ধু এই সামান্য মিষ্টির টুকরোটা বহন করতে তোমার দেখি জান বের হয়ে যাচ্ছে...! আমাকে দেখো, আমি এই বনের সব থেকে শক্তিশালী প্রাণী, আমি চাইলে এই বনের সকল গাছ উপড়ে ফেলতে পারি। এই বলে হাতিটা অহংকারের হাসি হাসতে লাগল।

এমন সময় পিঁপড়াটা বলল.. হাতি বন্ধু তুমি শুধু নিজের আকারটাই দেখলে আমার আকারটা দেখলে না? আমি যে মিষ্টির টুকরোটি বহন করছি সেটা আমার দেহের ওজনের থেকে প্রায় বিশগুণ বেশি ভারী। তুমি কি সেটা জানো? হাতিটা তখন হাসতে হাসতে বলল.. আরে ধুর এটা আবার জানার কী আছে, এটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না। এমন সময় পিঁপড়াটা বলল.. আচ্ছা হাতি বন্ধু তুমি কি পারবে নিজের থেকে বিশ গুণ বেশি ওজন বহন করতে..? হাতিটা

অহংকারে অন্ধ হয়ে বলল— কেনো পারব না অবশ্যই পারব। পিঁপড়াটা তখন বলল, আচ্ছা তবে দেখাও তোমার শক্তি। হাতিটা বলল আচ্ছা দেখ আমার ক্ষমতা। এই বলে হাতিটা একটা দুটো করে বনের বড়ো বড়ো চারটি গাছ শুঁড় দিয়ে উপড়ে ফেলে তার পিঠের মধ্যে রাখল যা হাতিটার ওজনের তিন গুণও নয়। হাতিটা আরো দুটি গাছ উপড়ে তার পিঠের মাঝে রাখল। এবার হাতিটার এতগুলো গাছ একসাথে পিঠে রাখতে একটু কষ্ট হচ্ছে। পিঁপড়াটা তখন বলল কী হাতি বন্ধু নিজের ওজনের থেকে মাত্র পাঁচ গুণ ওজন বহন করেই তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে?

এই নিজেকে শক্তিশালী ভাবো?

হাতিটা তখন বলল, আমি এখনো হার মানিনি, আমি আরো ওজন বইতে পারব.. এই বলে হাতিটা আরো তিনটি গাছ পর পর উপড়ে ফেলে তার পিঠের মাঝে রাখল এবার হাতিটার পুরো বেহাল দশা হলো। নিজের ওজনের থেকে মাত্র সাত গুণ ওজন বহন করতেই হাতিটার অবস্থা পুরো বেগতিক। তবুও পিঁপড়ার সাথে জিদ ধরে যেই আরেকটা গাছ উপড়ে নিজের পিঠে রাখবে, ঠিক তখন হাতিটা আর ওজন বহন করতে না পেরে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল, সাথে সাথে হাতিটার পিঠের উপরে থাকা গাছগুলোও তার উপরেই চাপা পড়ে গেল। তাই দেখে পিঁপড়াটা হাসতে হাসতে বলল- বন্ধু নিজের শক্তি এবং আকার নিয়ে কখনো অহংকার করতে নেই। আমি নিজের ওজনের থেকে প্রায় বিশ গুণ বেশি ওজন বহন করতে পারি, তবুও আমি কখনো নিজের শক্তির উপর অহংকার বা বড়াই করি না। আর তুমি নিজের শক্তি ও আকারের উপর এত অহংকার করো বলে আজ তোমার এই দশা হলো। এই বলে পিঁপড়াটা মিষ্টির টুকরোটা নিয়ে তার বাসায় চলে গেল।

এরপর অহংকারী হাতিটা তার সব ভুল বুঝতে পারল। এখন সে আর নিজের শক্তি এবং আকার নিয়ে কখনোই বড়াই বা অহংকার করে না। আর পিঁপড়ার এমন গুণ দেখে বনের সকল প্রাণী পিঁপড়াটাকে বাহবা দিতে লাগল। ■

আমিরা তাবাস্‌সুম, দশম শ্রেণি, সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী অ্যান্ড কলেজ টঙ্গি, গাজীপুর

বিশ্ব কারুশিল্প শহর সোনারগাঁ

আতিকুর রহমান

বিশ্ব কারুশিল্প শহরের মর্যাদা পেয়েছে চতুর্দশ শতকের মসলিন খ্যাত বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজধানী সোনারগাঁও। ১২ই অক্টোবর ২০১৯-এ প্রাচীন বাংলার রাজধানী ও মসলিনের শহর নারায়ণগঞ্জের ঐতিহাসিক সোনারগাঁকে 'বিশ্ব কারুশিল্প শহর' ঘোষণা করেছে ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেটরস কাউন্সিল (ডব্লিউসিসি)। এ সংক্রান্ত একটি চিঠি বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে পৌঁছেছে বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

উৎসব আয়োজনের মূল অনুষঙ্গ হিসেবে বিশ্ব কারুশিল্প পরিষদের (ডব্লিউসিসি) কাছে সোনারগাঁওকে কারুশিল্প শহরের মর্যাদা দিতে বাংলাদেশ কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও জামদানি উৎসবের আয়োজক বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। আবেদনের পর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ডব্লিউসিসির বিচারক দল সোনারগাঁও এলাকা পরিদর্শন করেন। সফরকালে বিচারকরা সোনারগাঁ'র কারু ও জামদানি শিল্পীদের মুনশিয়ানায় অভিভূত হন এবং জামদানি ও অন্যান্য নিখুঁত শিল্পকর্ম সংগ্রহের জন্য নিয়ে যান। তাঁরা সোনারগাঁকে 'বিশ্ব কারুশিল্প শহর' মনোনীত করেন।

এরপর জামদানি ও তাঁতশিল্পের জন্য সোনারগাঁওকে বিশ্ব কারুশিল্প শহরের মর্যাদা দেয়ার চিঠি পৌঁছে দেন বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের কাছে। চিঠির মাধ্যমে এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো স্থান বিশ্ব কারুশিল্প শহরের মর্যাদা লাভ করল। বাংলাদেশ সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের উদার সহযোগিতায় সোনারগাঁও-এর জন্য এই গৌরব বয়ে এনেছে। এই স্বীকৃতির ফলে জামদানি শিল্পের পীঠস্থান হিসেবে সোনারগাঁওয়ের সুনাম ও কৃতিত্ব বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত হবে। একইসঙ্গে উন্মোচিত হবে ক্রিয়েটিভ ট্যুরিজমের দ্বার। বিস্তৃত হবে স্থানীয় উদ্ভাবনী শক্তি, মেধা ও অভিজ্ঞতার পরিধি। সোনারগাঁওয়ের স্বীকৃতি এখন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিজ্ঞতা ও কৌশল বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে। ভারতের মহাবলিপুরম (পাথর খোদাই) ও জয়পুর (গহনা), চীনের ফুশিন (অ্যাগেট), থাইল্যান্ডের সাখন নাখন (ইন্ডিগোডাই), ডেনমার্কের বর্নহোম (সিরামিক), ইরানের কারপোরগান (মৃৎশিল্প) ও ইসফাহানসহ বিশ্বের অন্যান্য কারুশিল্প শহরের সঙ্গে সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব ও বিনিময়ের অভিনব সুযোগ সৃষ্টি করবে। সোনারগাঁও থানার পূর্বনাম ছিল বৈদ্যের বাজার থানা। বৈদ্যের বাজার থানা মেঘনার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালের ১৩ই মার্চ বৈদ্যের বাজার থানার নাম পরিবর্তন করে সোনারগাঁও থানা করা হয় যা পরবর্তীতে হয় সোনারগাঁও উপজেলা। মসলিনের জন্য সোনারগাঁ আগে থেকেই বিখ্যাত। এ ছাড়া সোনারগাঁ'র পানাম নগরী বিশ্বের ধ্বংসপ্রায় ১০০ প্রাচীন নগরীর মধ্যে অন্যতম। এবার ডব্লিউসিসির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে জামদানি শিল্পের পীঠস্থান হিসেবে সোনারগাঁর সুনাম ও কৃতিত্ব বিশ্ব দরবারে আবার প্রতিষ্ঠিত হলো। ■

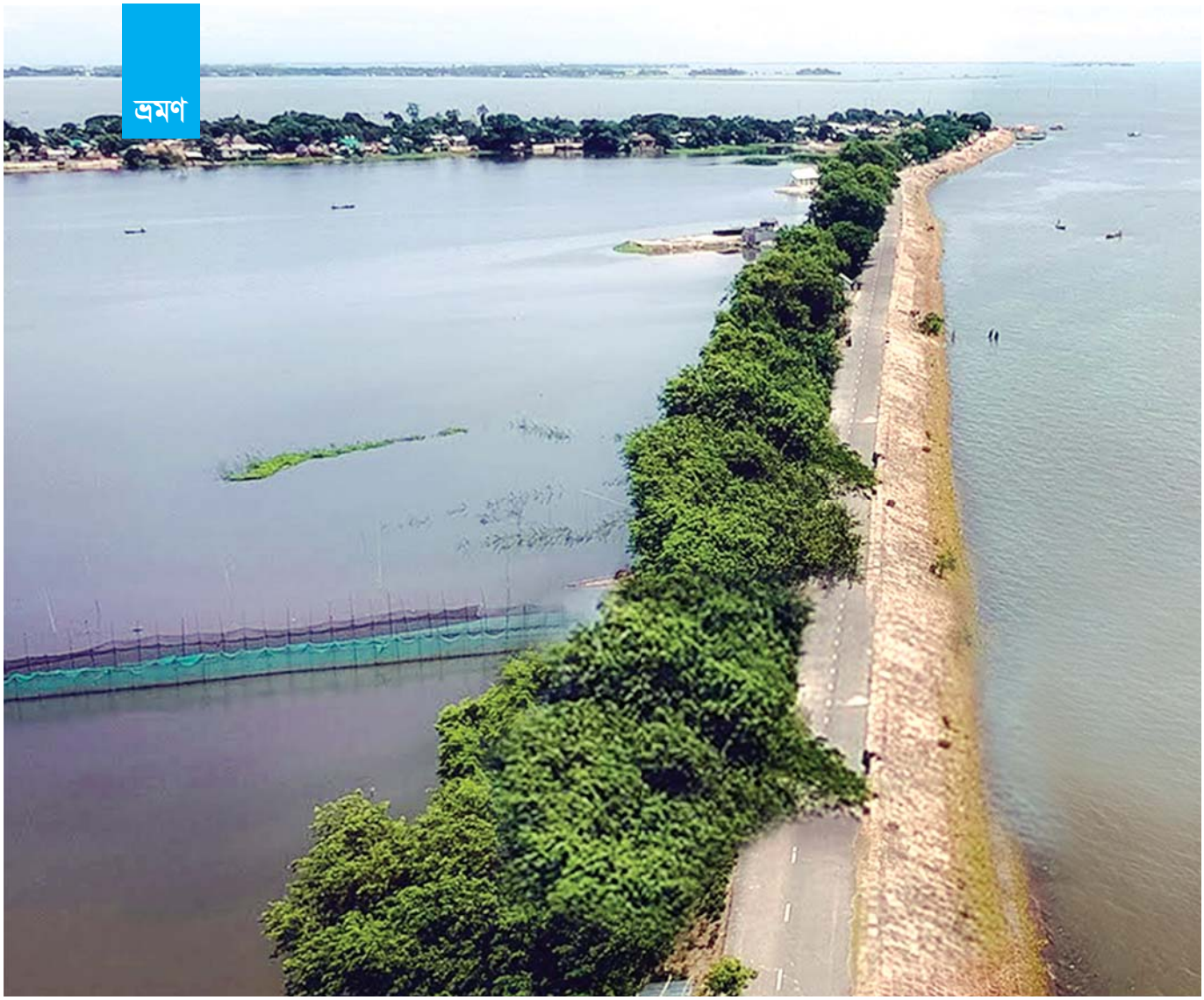

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমন বৈচিত্র্যময় ঋতুর সমাবেশ নেই। তাই তো কবি বলেছেন,

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভুমি।

শহরের বদ্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে আমাদের মন সর্বদাই ছটফট করে। তাই সময় পেলেই শহুরে মানুষ শহরের যান্ত্রিক কোলাহল এবং দূষণমুক্ত প্রকৃতি উপভোগের জন্য গ্রামের দিকে ছুটে।

সেপ্টেম্বর মাস। শরতের কাশবনের অপরাপর প্রকৃতির রং রূপ সকলকেই মুগ্ধ করে। বৃহস্পতিবার অফিস শেষে বাসায় ফেরার পর পরিবারের সদস্যদের নিকট সাপ্তাহিক ছুটির দুদিন কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসার প্রস্তাব পেশ করলাম। মুহূর্তেই প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। সেই সাথে নিকটাত্মীয় আরো সাতজন যোগ হয়ে সদস্য সংখ্যা বারো তে দাঁড়িয়ে গেল।

সকাল ৬.০০ টা। মাইক্রোবাসে বারো জনের টিম মিরপুর থেকে আশুলিয়া বেড়িবাঁধ হয়ে সোজা নিকলির পথে চলতে লাগলাম। গাজীপুর চৌরাস্তা পার হয়ে পথের ধারে একটি হোটেলে পরোটা, ডিমভাজা ও সবজি দিয়ে নাশতা সেরে ফেললাম।

নাশতা সেরে আবারও ছুটে চলা নিকলীর পথে। চলতে চলতে মহাসড়ক ছেড়ে ডানে মোড় নিয়ে কাপাসিয়ার দিকের সড়কে চলছি। দু'পাশে ঘন শালবন। মাঝে সরু সড়ক। সকাল দশটার মধ্যেই কিশোরগঞ্জের বিন্নাটির মোড়ে পৌঁছলাম। রাস্তায় দোকানিদের কাছ

জলকাব্যের হাওর

হাছিনা বেগম

থেকে নিকলী যাওয়ার সঠিক পথ জেনে নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই পুলের ঘাট বাজারে পৌঁছলাম। যেতে যেতে পথের সৌন্দর্যে বিভোর হতে থাকলাম। গ্রাম বাংলার অসাধারণ নয়নাভিরাম রূপ যেন নিকলীর পথের গ্রামগুলোর ওপর ভর করেছে। দিনের আলোর চেনা-অচেনা পাখির কলতান সঙ্গী করে গাড়ি এগিয়ে চলছে। নিকলী বেড়িবাঁধে যখন ঢুকি তখন মনে হলো এ যেন অন্য আরেক জগৎ, যে জগতে শুধু প্রকৃতিরই বিচরণ। উপজেলা পরিষদের ভবন পেছনে ফেলে একেবারে বেড়িবাঁধের শেষ অব্দি এগিয়ে যাই। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। সে এক অপরূপ দৃশ্য। এ হাওরের নাম নিকলী। কিশোরগঞ্জ জেলার অন্যতম নয়নাভিরাম হাওর। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অসাধারণ ভালো লাগার। নিকলী বেড়িবাঁধ হাওরের নান্দনিকতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে জেলেদের মাছ ধরার কর্মযজ্ঞ।

বেড়িবাঁধ থেকে নৌকা নিয়ে আমরা গেলাম রাতারগুলের মতো জলাবনের জায়গা ছাতিরচর গ্রাম। চারিদিকে বিস্তৃত জলরাশি। কিছুদূর পর পর পানিতে দ্বীপের মতো ভেসে বেড়ানো গ্রাম। দূরদিগন্তে দেখা মেলে মাছ ধরা নৌকায় জেলেদের ব্যস্ততা আর রাতারগুলের মতো ছোটো ছোটো জলাবন। এসব নিয়েই নিকলী হাওর ছড়ায় তার প্রাকৃতিক রূপ। পানিতে ভাসতে ভাসতে হাওরের ভেতরের দিকে গেলে এক পর্যায়ে কোনো গ্রাম দেখা যায় না, তখন হাওরকে শান্ত একটা সাগরের মতো মনে হয়।

ছাতিরচরে রয়েছে পানির নিচে ডুবন্ত এক সবুজ বন। লেয়ারে লেয়ারে সাজানো সবুজ গাছ। গাছের বুক বরাবর পানিতে ভাসতে ভাসতে মনে হয় এ যেন আরেক রাতারগুল। টিমের ছোটো সদস্যরা কাপড়-চোপড় পালটে নিয়ে হাওরের পানিতে মজা করার জন্য নেমে পড়ল এবং সেলফি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কখন যে বেলা গড়িয়ে অন্ধকার নেমে এল বুঝতেই পারলাম না। হাওরের সূর্যাস্ত সে এক মনোরম দৃশ্য। হিজল, করমচা গাছগুলোকে শত প্রতিকূলতার মাঝে টইটম্বুর পানির বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। হাওরের পাট থেকে আঁশ তোলা শ্রমজীবী মানুষ এবং জেলেদের চোখেমুখে সুন্দর হাসি দেখে প্রশান্তিতে মন ভরে যায়।

এক সময়কার পাটের দেশ হিসেবে খ্যাত নিকলী উপজেলা। কিশোরগঞ্জের প্রাচীনতম উপজেলা নিকলীকে বর্ষা মৌসুমে মিনি পর্যটনকেন্দ্র বলা হয়ে থাকে। নিকলীর নৌকাবাইচ দেশব্যাপী সমাদৃত। পাটের জন্য বিখ্যাত বলে ব্রিটিশ আমলে নিকলী দামপাড়া থেকে সুদূর লন্ডনে পাট পাঠানো হতো। এ জন্য ব্রিটিশদের একটি সিল মোহর ছিল (NDP) মানে N= নিকলী, D= দাম, P= পাড়া। নিকলীর সাঁতার প্রতিযোগিতার দেশে- বিদেশে ব্যাপক সুনাম রয়েছে।

রাতের আঁধার নেমে এলে এবার ফেরার পালা। কম সময়ে ঢাকা শহরের কাছের কোনো দৃষ্টিনন্দন জায়গায় ঘুরে আসতে পেরে বেশ ভালো লাগল। এজন্য গাড়িচালকসহ টিমের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ ! ■

নিবন্ধ

বিস্ময়কর নেট্রন হ্রদ

রায়হান সফিক

রূপকথার গল্পের মতোই সুন্দর অথচ ভয়ংকর। রহস্যে ঘেরা যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী। সরাসরি মৃত্যু নেই। কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আছে। হ্যাঁ, বন্ধুরা এতক্ষণ একটি হ্রদের কথাই বলছিলাম। হ্রদটির নাম নেট্রন। দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ তানজানিয়ার উত্তর প্রান্তে হ্রদটি এখনো রহস্যময়। ২০১১ কোনো ত্রুটি। সযত্নে তৈরি করা হয়েছে বাদুড়, মাছরাঙা, রাজহাঁস, ঈগলের মতো নানা জাতের প্রাণীর মূর্তি। বাস্তবে এগুলো মূর্তি নয়। জীবন্ত জীবাশ্ম আবার মমিও বলা যায়। নেট্রন হ্রদের পানিতে নামলে কোনো প্রাণী আর বেঁচে ফিরতে পারে না। যারাও কোনো রকমে তীরে উঠতে পারে তাদের অবস্থা হয় আরো খারাপ। কারণ ওই হ্রদের পানি আগুনের মতো গরম। সবসময় পানির তাপমাত্রা থাকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই কোনোমতে ডাঙায় উঠতে পারলেও ধীরে ধীরে তার শরীর পাথর হয়ে যায়। এরপর ভিজা শরীর যত শুকায় ততই কামড়ে ধরে সোডা আর নুন। একসময় জীবন্ত অবস্থাতেই মূর্তিতে পরিণত হয় সব প্রাণী।

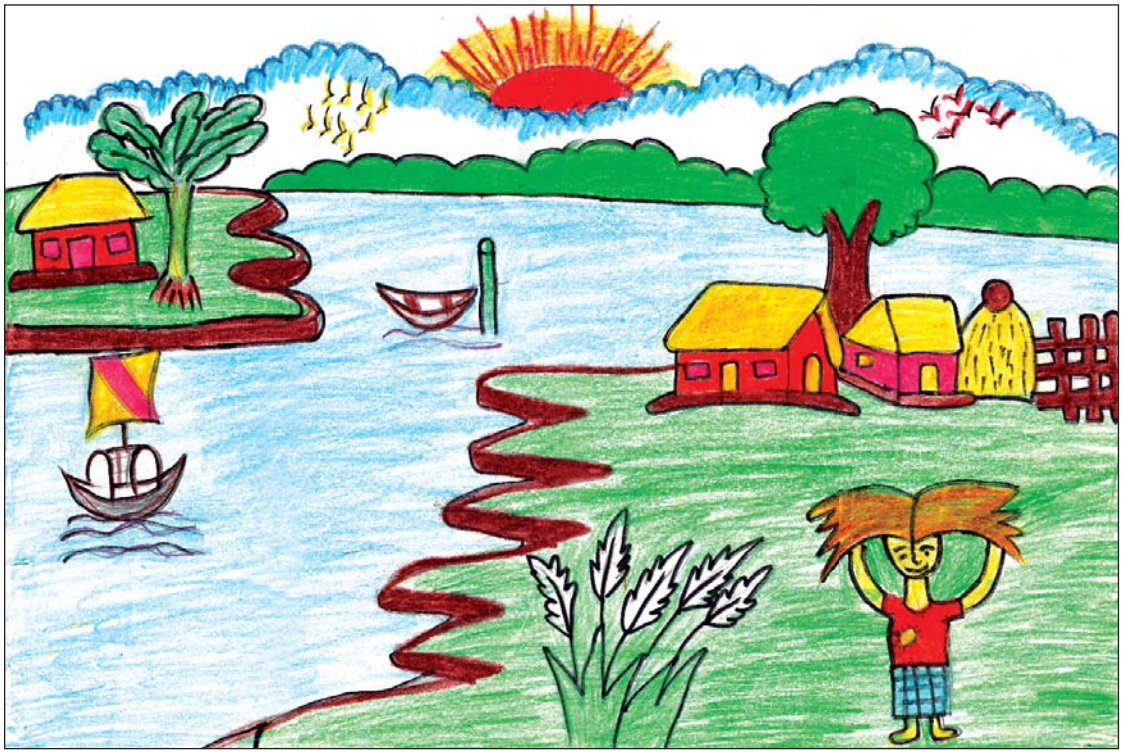

মু. আহনাফ সিদ্দিক, দ্বিতীয় শ্রেণি, গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পটুয়াখালী

নেট্রন হ্রদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য সারিবদ্ধ পশু-পাখি পাথরের মূর্তি। যেগুলো ওই হ্রদের শিকার। মূলত হ্রদের পানিতে সাঁতার কাটতে গিয়েই পশু-পাখিগুলোর ওই অবস্থা হয়েছে।

৫৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ও ২২ কিলোমিটার প্রস্থ এ হ্রদটিতে এওয়াসো নায়গ্রো নদীর পানি এসে পড়ে। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি উষ্ণ ঝরনার পানি এ হ্রদটিতে পড়ে। এর গভীরতা মাত্র ১০ ফুট। প্রচুর সোডিয়াম ও কার্বনেট যুক্ত ট্র্যাফাইট লাভা দিয়ে বহুকাল আগে তৈরি হয়েছে এই হ্রদের তলদেশ। যে কারণে এই হ্রদের তাপমাত্রা সব সময় থাকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা বেশি থাকায় হ্রদের পানি দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। তার পরিবর্তে পড়ে থাকে লাভা, যা পানির মতোই তরল। এদিকে, সোডিয়াম ও ক্ষারধর্মের জন্যে হ্রদে জন্ম নেয় সায়ানো ব্যাকটেরিয়া নামের অনুজীব। এদের শরীরে থাকে লাল রঞ্জক। এ কারণেই লেকের পানি দূর থেকে লাল রক্তের মতো দেখায়। এই লাল রংই পাখিদেরকে আকৃষ্ট করে।

সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই হ্রদে পাখিদেরকে নামতে হয় না। হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে গেলেই পড়ে যায় হ্রদের পানিতে।

এটা কেন হয় জানো বন্ধুরা।

ওই হ্রদে পানির পরিবর্তে লাভা থাকায় সূর্যের রশ্মি হ্রদ থেকে বেশি প্রতিফলিত হয়। ফলে পাখিগুলো যখন নেট্রন হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে যায় তখন তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর তখনি পড়ে যায় হ্রদের পানিতে। নেট্রন হ্রদের পানি ক্ষারধর্মী হলেও এই হ্রদই পূর্ব আফ্রিকার লেসার ফ্লেমিঙ্গোদের সবচেয়ে বড়ো এক প্রজনন ক্ষেত্র। প্রায় ২৫ লক্ষ ফ্লেমিঙ্গোদের বাস এই হ্রদে। নেট্রন হ্রদের অগভীর পানিতে রয়েছে প্রচুর নীলাভ-সবুজ শৈবাল। এই শৈবাল খেয়েই ফ্লেমিঙ্গোরা বেঁচে থাকে ও বংশ বৃদ্ধি করে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন ফ্লেমিঙ্গোরা এই ক্ষারধর্মীয় হ্রদের পানিতেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। একারণেই নেট্রন হ্রদের পানিতে ফ্লেমিঙ্গোদের জমাট দেহ খুঁজে পাওয়া যায় না। ■

ছোটোদের লেখা

চায়ের বাড়িতে যখন

সামিয়া হোসেন

আমার শখ বই পড়া এবং ভ্রমণ করা। আমার ছোটো বোন সাবা প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। তারও শখ ভ্রমণ করা। বেহেস্তী ও আফীফা নামে আমার দুই বন্ধু আছে, তারাও অনেক ভ্রমণ করে। ওরা আমাদেরকে শ্রীমঙ্গলও, সিলেট বেড়াতে যেতে বলেছিল। প্রধান কারণ শ্রীমঙ্গলে গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্ট ও গল্ফ নামে একটি আকর্ষণীয় হোটেল দেখার জন্য। প্রথমে আমরা এটি সম্পর্কে জানতাম না। আমার বন্ধুরা আমাকে বলেছে যে এটি সম্ভবত বাংলাদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও সুন্দর হোটেল। একথা শুনার পর, আমরা আমাদের বাবা-মাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তারাও আমাদের সাথে একমত হয়। তাই আমরা অন্য একটি পরিবারের সাথে গ্রুপ করে সেখানে যাই।

সড়ক পথে সিলেট

আমরা অনেক আনন্দের সাথে ব্যাগপত্র গুছিয়ে সকাল ৮ টা ২০ মিনিটে একটি প্রাইভেট গাড়িতে যাত্রা শুরু করি। উজানভাটি (ভৈরব) নামে একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেয়ে আবার যাত্রা শুরু করি। শ্রীমঙ্গল শহরে পৌঁছার আগেই, 'চায়ের দেশে স্বাগতম' জানানো একটি বড়ো মূর্তি দেখেছি যার নাম 'চা কন্যা'। এটা খুবই সুন্দর। আমরা সেখানে কিছু ছবি তুলি। এরপর আবার যাত্রা শুরু করি। শ্রীমঙ্গলে প্রবেশ করে অনেকে আনারস, লেবু এবং অন্যান্য সবজি বিক্রি করতে দেখি। তখনই আমি জানতে পারলাম যে শ্রীমঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে চা পাতা, আনারস ও লেবু উৎপাদিত হয় এবং শ্রীমঙ্গলকে চায়ের রাজধানী বলা হয়। আমরা রাস্তায় অনেক চা বাগান দেখতে পাই। চা বাগান দেখতে খুবই সুন্দর, চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। আমি সত্যিই খুব উপভোগ করেছি।

গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্ট ও গল্ফ

শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের গন্তব্য গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্ট ও গল্ফ-এ পৌঁছলাম। প্রথমে আমরা অভ্যর্থনা কক্ষে বসি (বিশাল হল রুম) এবং তারা আমাদেরকে জুস দিয়ে আপ্যায়ন করে। স্টাফরা আমাদের লাগেজ কক্ষে নিয়ে যায়। তারপর আমরা ফ্রেশ হয়ে সুইমিং পুলে যাই। সুইমিং পুলের পানি এত স্বচ্ছ যে পানির নীচের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়। এ কারণে পানির গভীরতা বুঝা যায় না। সেখানে একটা বোর্ডে গভীরতা লেখা আছে। আমরা সেখানে খুব মজা করি। তারপর আমরা রুমে যেয়ে বিশ্রাম নিয়ে। আমি এবং আমার বোন বই পড়ার জন্য লাইব্রেরিতে যাই। এখানে সব ধরনের বই আছে। আমরা আমাদের প্রিয় বই পড়তে পেরেছি। লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে হোটেলের চারপাশ ঘুরে দেখি। এই হোটেলেও সিলেটের মতো সবুজ চা বাগান আছে। বাচ্চাদের জন্য একটি খেলার জায়গা আছে। বড়োদের জন্যও খেলার অনেক জায়গা আছে, গলফ মাঠ আছে। তাদের একটি স্পা এবং একটি জিম সেন্টারও আছে। হল রুমটা খুব সুন্দর। এছাড়া এই হোটেলের খাবারও খুব সুস্বাদু। স্টাফদের আচার আচরণ খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। এই হোটেলটি আমার খুব ভালো লেগেছে।

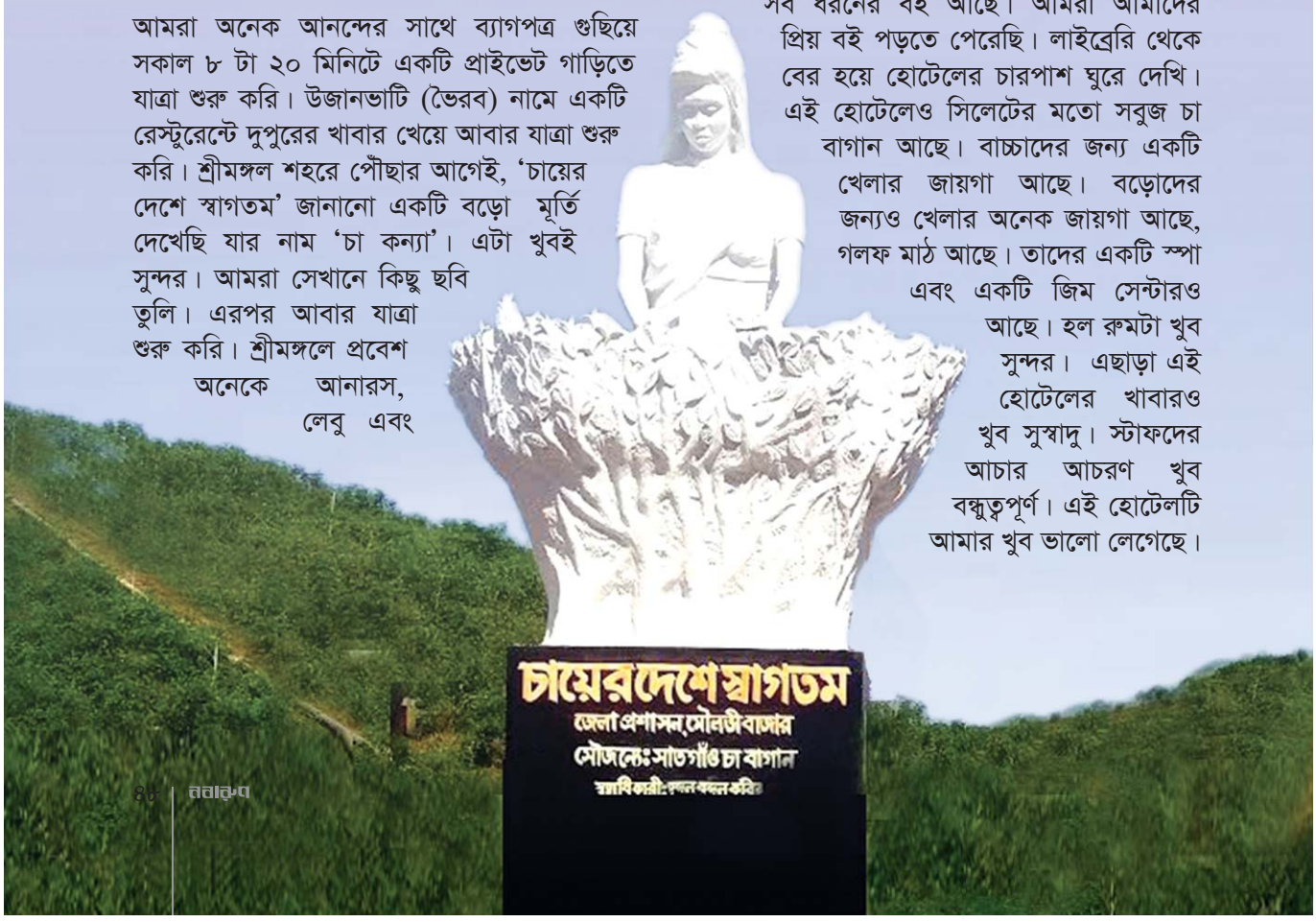

বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি হামিদুর রহমান মনুমেন্ট (ধলাই)

দ্বিতীয় দিন আমরা ঐতিহাসিক বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকা ধলাই যাই। সেখানে বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি হামিদুর রহমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। এ কারণে সেখানে বিডিআর বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি হামিদুর রহমানের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে। এটি সীমান্তের কাছাকাছি, এখানে আমরা কিছু ভারতীয় গ্রামবাসী দেখতে পাচ্ছিলাম। আমরা দু-দেশের সীমান্তের নো ম্যানস ল্যান্ড দেখলাম। আসা-যাওয়ার পথে অনেক চা বাগান রয়েছে যা খুবই আকর্ষণীয়।

মাধবপুর লেক

এরপর আমরা মাধবপুর লেক দেখতে যাই। মাধবপুর লেক বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের জনপ্রিয় পর্যটন স্থান। গেট দিয়ে প্রবেশ করে, ২মিনিট হেঁটে একটু উপরের দিকে উঠতেই এই লেক দেখা যায়। স্বচ্ছ পানি নীল রঙের শাপলা আর সবুজ চা বাগান একে করেছে আরো সুন্দর। নীল রঙের শাপলা আমি এর আগে কখনও দেখিনি। এটি আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর ফুল। চারদিকে পাহাড় ঘেরা একটি সুন্দর লেক। তারপর আমরা চা বাগানের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠি। পাহাড়ের উপর থেকে সমগ্র লেক দেখা যায়। সেখান থেকে লেকটি দেখতে এত সুন্দর লাগছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান বা লাউয়াছড়া রেইন ফরেস্ট বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। ১৯৭৪ সালের বন্যপ্রাণী আইন অনুযায়ী, ভানুগাচ রিজার্ভ ফরেস্টকে ১৯৯৬ সালে সরকার লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করে। এই বনে বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী এবং পাখি দেখা যায়। আনুমানিকভাবে ৪৫০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৫ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ৫২ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৬০ প্রজাতির পাখি এবং ২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এই জঙ্গলে দেখা যায়। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান প্রকৃতি প্রেমিকদের জন্য একটি বিস্ময়কর পর্যটন স্পট। সবুজ এবং নীরব পরিবেশ মন-প্রাণকে সতেজ করে তোলে। নিরাপদে ঘুরে দেখার জন্য সারা বন জুড়ে রয়েছে পায়ে হাঁটার পথ। বনের ভিতর একটি চা স্টল আছে, সেখানে স্থানীয় সাত-পনেরো রঙের লেয়ার চা পাওয়া যায়। এটি আরো বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে বিখ্যাত বিজ্ঞানভিত্তিক হলিউড মুভি 'Around the World in 80 Days (1956)' এই সিনেমাটির কিছু অংশ বনের রেললাইনে চিত্রায়িত হয়েছিল। এছাড়া খ্যাতিমান লেখক হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্র 'আমার আছে জল' ২০০৮ সালে এখানে চিত্রায়িত হয়েছিল।

আমার কাছে সিলেট খুব সুন্দর জায়গা । আমি মনে করি এটা ভূ-স্বর্গ। আমি সবসময় সেখানে যেতে চাই। ■

ষষ্ঠ শ্রেণি, শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

গল্প

আমার দেখা একজন মুক্তিযোদ্ধার গল্প

তাজিয়া কবীর

নাম তাঁর আলহাজ সুলতান শেখ। এখন হাজি হলেও, তখন তিনি হাজি ছিলেন না। সেদিন ছিলেন শুধুই সুলতান নামের টগবগে একজন যুবক। মা-বাবার তিন সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র সন্তান সুলতান। লেখাপড়া শেষ করার আগেই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ডাকে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন।

গল্পটা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এক মুক্তিযোদ্ধার গল্প। বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব, তবুও এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাহআল্লাহ'। যুবক সুলতান সেদিন রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের ভাষণ শুনে আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি, তাই তাঁর আরো বন্ধুদের নিয়ে সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করে। সেদিন মা-বাবা, আর বোনদের না জানিয়েই রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং মনে মনে শপথ নেয়, 'মা কে না জানিয়ে আমি দেশ মাতাকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি, দেশকে স্বাধীন করে তবেই আমি তোমার সামনে আসব ইনশাহআল্লাহ, তার আগে নয়। তুমি আমাকে দোয়া করো মা, তোমাকে না জানিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও'। মুক্তিযোদ্ধা সুলতান তাঁর বন্ধুদের নিয়ে প্রথমে মাজদি ক্যাম্পে যায়, সেখানে অস্ত্রের ট্রেনিং নাই বলে, তৎকালীন আওয়ামীলীগ নেতা ওবায়দুর রহমানের সাথে দেখা করে, তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে বাগদা হয়ে ভারতের চব্বিশ পরগনায় মেজর জলিলের কাছে চলে যায়। মেজর জলিল ছিলেন ৯ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার। তাঁর অধীনেই এই মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করে। তাদের ক্যাম্পের নাম ছিল, বাখুন্দিয়া অপারেশন ক্যাম্প।

সারাদেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, পাকহানাদার বাহিনী বাংলার মানুষকে পাখীর মতন গুলি করে মারছে। ঘরবাড়ি লুট করে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, নারীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। আর তাদের সাহায্য করছে এদেশেরই মানুষরূপী কিছু মীরজাফরের দল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও পাকিস্তানিদের চেয়ে কোনো অংশে কম নেই। ওদের মতন এত ভারী অস্ত্র, কামান না থাকলেও তাদের মনোবল ছিল অনেক বেশি।

তাদের সবারই স্বপ্ন একটা, দেশকে স্বাধীন করা, দেশ মাতাকে পরাধীনতার গ্লানি হতে মুক্ত করা। মুক্তিযোদ্ধা সুলতান সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি আর্মিদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বর্ডার পার হয়ে দেশে এসে এখানকার খোঁজখবর নিয়ে যায় এবং নতুন ছেলেদেরকে যুদ্ধে যাবার জন্য উৎসাহিত করে ভারতে নিয়ে যায়, এভাবে সে অনেক ছেলেদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করিয়েছে। ফরিদপুর জেলার সকল গ্রাম থেকেই অনেক ছেলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গিয়েছে নাজিরপুর গ্রাম থেকে, এই গ্রাম থেকে মোট ১৪ জন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সুলতান গ্রামে এসে এইসব গোয়েন্দার কাজ করতো রাতের অন্ধকারে, এর মধ্যে সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছে, সে একবারও মায়ের সামনে আসেনি, সে প্রতিজ্ঞা করেছে, দেশ স্বাধীন করে, তবেই সে মার সামনে যাবে, তার আগে নয়।

এদিকে সুলতানের মা ছেলেকে ঘরে না দেখে, সারা বাড়ি খুঁজে না পেয়ে, স্বামী কে বললেন, 'সুলতান ঘরে নেই, সারা বাড়ি খুঁজেছি কোথাও নেই'। বাবা আবুল কাশেম স্ত্রী কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'চিন্তা করো না, হয়ত কোনো বন্ধুর বাড়িতে গেছে, চলে আসবে। সারাদিন কেটে গেল, রাতও পার হয়ে গেল সুলতানের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। মার চোখে ঘুম নাই, খাওয়া নেই, দুই দিন পার হয়ে যাবার পর বাবা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, তার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে, ওর মা জানলে যুদ্ধে যেতে দিবে না, এই ভয়েই সে কাউকে না জানিয়েই, পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছে। মা মাজেদুন নেসা যখন জানতে পারলেন, তার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে তখন নামাজে বসে ছেলের জন্য আল্লাহর দরবারে দেওয়া চাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। জোরে কান্নাকাটিও করা যাবে না, কারণ কোনো রাজাকার যদি জানতে পারে সুলতান যুদ্ধে গিয়েছে, তাহলে সাথে সাথেই পাকিস্তানি আর্মিদের ক্যাম্পে খবর দিবে। পাকিস্তানি আর্মিদের ক্যাম্প ছিল ভাঙ্গা থানার ডাক বাংলায়, এখন ভাঙ্গা উপজেলা হয়েছে। সুলতানের বাবা আবুল কাশেম, সুলতানের অন্য বন্ধুদের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, সুলতান তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে ভারতের ২৪ পরগনা জেলায় বাখুন্দিয়া অপারেশন ক্যাম্পে আছে এবং ভালো আছে। এই খবরটি বাড়ি এসে সুলতানের বাবা আস্তে করে স্ত্রী কে জানালেন, বললেন কান্নাকাটি না করে ওদের সবার জন্য নামাজে বসে আল্লাহর দরবারে দোয়া চাওয়ার জন্য। পাকিস্তানি আর্মিদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সুলতানের কয়েকজন সহযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। চোখের সামনে কত যোদ্ধাদের আহত হতে দেখেছেন, তাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তুলেছেন, কিন্ত কখনো মনোবল হারায়নি, তার স্বপ্ন একটাই, দেশ স্বাধীন করে তবেই মায়ের সামনে যাবে। মায়ের হাতে লাল-সবুজের পতাকা তুলে দেবে।

মা-বাবার সাথে দেখা না হলেও, রাতের আঁধারে গ্রামে এসে সব খবরাখবর নিয়ে যেত, এমনি একটা ঘটনা সুলতানদের পাশের গ্রামে ঘটে, গ্রামের নাম পোদ্দার বাড়ি, সেই গ্রামের কলিমন সেনের বাড়িতে তাদের এক আত্মীয় ভাঙ্গা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে, নিজের বাড়িঘর ছেড়ে, পাকিস্তানি আর্মিদের ভয়ে, প্রাণ রক্ষার জন্য এই অজপাড়াগায় এসেছেন তারা। পরিবারের মা বাবা, ভাই বোন ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন মিলে মোট ৩৫ জন ছিল তারা। হিন্দুদের প্রতি পাক আর্মিদের আক্রোশ বেশি ছিল, তাই ভাঙার বিশিষ্ট হিন্দু ব্যাবসায়ী টনিকও সেই ভয়ে সেই গ্রামে তার আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পাড়াগাঁয়ে পালিয়ে এসেও পারেনি নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতে, পারেনি যুবতী বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে।আর সেটা সম্ভব হয়েছে কিছু এদেশেরই মানুষ, যারা পাকিস্তানিদের দেশের হয়ে কাজ করেছে, বেঈমানী করেছে মাতৃভূমির সাথে, এদেশের মানুষের সাথে। তেমনি একজন মানুষ ঐ পোদ্দার বাড়ি গ্রামের কলিমন সেনের বাড়িতে এসে টনিকদের খোঁজখবর নিয়ে, ভাঙ্গায় পাক আর্মিদের ক্যাম্পে খবর দিয়ে নিজেকে পাক আর্মিদের পিয়ারে দোস্ত মনে করে যে লোকটি তার নাম এমদাদ কাজী রাজাকার।খবর দেয়ার পরেরদিনই ঐ সেন বাড়িতে পাক আর্মিরা অস্ত্র সহ গাড়ি বোঝাই করে এসে হাজির। তারপর যা হবার তা ই হলো, ৩৫ জন নিরস্ত্র মানুষকে চোখ বেঁধে, পিছে হাত বেঁধে, ব্রাশফায়ার করে মারা হয়। বাড়িঘর লুট করে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। যুবতী মেয়েরাও রেহাই পায়নি নির্যাতন থেকে।

মুক্তিযোদ্ধা সুলতান নিজের চোখে এ দৃশ্য দেখেছে, শুধু দেখেই ক্ষান্ত হয়নি, তার বন্ধুদের সাহায্যে নিজে মাটি খুড়ে গর্ত করে ঐ ৩৫ জন মানুষের লাশ মাটির নীচে পুঁতে রেখেছে। গ্রামের মানুষ আর্মিদের ভয়ে কেউ কাছে আসেনি। এই ৩৫ জনের মধ্যে একজন ছিল ফুটবল প্লেয়ার, তার নাম শম্ভু সে টনিকের ভাগনে হতো সমস্পর্কে, এই শম্ভু সুলতানের বন্ধু ছিল। একাজ সম্পন্ন করে মুক্তিযোদ্ধা সুলতান, আরো নতুন যোদ্ধাদের নিয়ে আবার ভারত চলে যায় এবং বীরের ন্যায় মুক্তিযুদ্ধ করতে থাকে। এভাবেই যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে বাংলার দামাল ছেলেরা। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই বাংলাদেশ।

যুদ্ধ শেষ, দেশ স্বাধীন হয়েছে, তারপরও মুক্তিযোদ্ধা সুলতান তার একজন সহযোদ্ধা বন্ধুকে হারিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেল ফরিদপুর জেলার মমিন খাঁর হাট নামের এক জায়গায় বিহারিরা পালিয়ে আছে, তাদের ধরার জন্য বিহারি ও মুক্তি বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে, বিহারিদের ছোড়া গুলিতে শহীদ হন মুক্তিযোদ্ধা জহুর। পুকুরিয়ার পাশে মাধবপুর গ্রামের তার বাড়ী। দেশ স্বাধীন করে শত্রু মুক্ত করার পরেও কিছু জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য জহুরকে প্রাণ দিতে হলো, তিনি শহিদ হলেন। সুলতান সহ আরো মুক্তিযোদ্ধারা মিলে তাকে শেষ বিদায় জানালো এবং মাধবপুর কবরস্থানে তাঁকে কবর দেয়া হলো। আজও বিজয় দিবসে, স্বাধীনতা দিবসে এই বীর শহিদকে শ্রদ্ধা জানানো হয় ঐ কবরস্থান গিয়ে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন সকল শহিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাবে বাংলার মানুষ। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে রক্তের বিনিময়ে আমরা এই বাংলাদেশ পেলাম তাদের কি কখনো ভোলা যায়? আমরা তোমাদের ভুলবো না।

মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাকে দেয়া কথা রক্ষা করেছে, দেশ স্বাধীন করে বীরের বেশে সে মায়ের সামনে এসেছে। দীর্ঘ নয় মাস পর ছেলেকে বুকে পেয়ে মা বাকরুদ্ধ, শুধু চোখের জল ফেলেছেন অঝোরে, তবে এ জল দুঃখের নয়, আনন্দের। ভোগের নয়, ত্যাগেই আনন্দ বেশি, এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন সকল মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের মায়েরা। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতেই সেইসব মায়েদের কথা মনে পড়ে যায়। শহিদ জননী জাহানারা ইমাম, শহিদ আজাদের মা মোসাম্মাৎ সুফিয়া বেগম, আরো লাখো শহিদের মায়েদের কথা, যারা দেশের জন্য নিজের সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন এই মায়েদের নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে। ■

বাংলাদেশের হুইল চেয়ার ক্রিকেট

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মহসিন ছোটোবেলা থেকেই পোলিও রোগে আক্রান্ত। মা ও বোনের সহযোগিতায় স্কুলে যেতেন। শারীরিক অক্ষমতা থাকলেও তিনি স্কুলের খেলাধুলায় অংশ নিতেন আর ভাবতেন তার মতো যারা বিশেষ শিশু তাদের ও তো খেলতে ইচ্ছে হয়। তাই তখন থেকেই মহসিনে স্বপ্ন ছিল প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কিছু করার।

সে আশাতেই ২০১০ সাল থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ক্রিকেটার খুঁজে বের করার কাজ শুরু করেন। মহসিনের ফেসবুক পোস্টটি ভারতের প্রতিবন্ধী ক্রিকেটারদের নিয়ে কাজ করা ক্রিকেট কোচ ও সংগঠক রশিদের চোখে পড়ে। তার উৎসাহেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ক্রিকেটারদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু। এরপর গঠন করেন হুইলচেয়ার ক্রিকেট দল। বাংলাদেশে এখন প্রায় ২০০ হুইলচেয়ার ক্রিকেটার আছেন। নারী ক্রিকেটার আছেন ১৭ জন।

মহসিনের গড়া হুইলচেয়ার ক্রিকেট দল এ পর্যন্ত ৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন তারমধ্যে ৩টিতে চ্যাম্পিয়ন ও ২টিতে রানার্সআপ হয়। তিনি বাংলাদেশে হুইলচেয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন গঠনের পর গঠন করেছেন ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব হুইলচেয়ার ক্রিকেট। সেই সংস্থার চেয়ারম্যান পাকিস্তানের জিশান, ভাইস চেয়ারম্যান ভারতের হারুণ রশিদ আর নেপালের ছুলটিম শেরপা আছেন সভাপতির দায়িত্বে। এবং মহসিন নিজে সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। এই সংস্থাটি বর্তমানে আইসিসির অনুমোদনের অপেক্ষায়।

বাংলাদেশের বড়ো সাফল্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ

প্রতিবন্ধী তরুণদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিযোগিতা 'গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০১৯'-এ বাংলাদেশের দুই তরুণ করেছে বড়ো সাফল্য।

দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানের পুকইয়ং ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ দিনব্যাপী এই প্রতিয়োগিতা শুরু হয় ২৫ শে নভেম্বর। প্রতিযোগিতায় আলাদা দুটি বিভাগে ২৮ শে নভেম্বর প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পায় বাংলাদেশের

ফারহান ইকবাল ও মো. আশিকুর রহমান। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলর (বিসিসি) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ এবং প্রতিবন্ধী তরুণদের জিআইটিসির বাংলাদেশের সমন্বয়ক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান। এ প্রতিযোগিতা ২০১১ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার বাংলাদেশসহ এ প্রতিযোগিতায় যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং ভারতের তিন শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেয়। বাংলাদেশ থেকে মোট চারজন অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ই-টুল চ্যালেঞ্জে শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিভাগে বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পান ফারহান। যিনি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পরিচালিত মিরপুরের সরকারি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। অন্যজন ই-টুল চ্যালেঞ্জের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিভাগে মো. আশিকুর রহমান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড (দ্বিতীয় পুরস্কার) পান। আশিকুর ঢাকায় ডেমরা গ্রিন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ■

মজার ধাঁধা

১. বহু দাঁত রয়েছে কিন্তু কোনো কিছু খায় না। বলো তো কী ?
২. কোন জিনিসটির বাইরের দিকের অংশ খেয়ে ভেতরের অংশটি আমরা ফেলে দেই ?
৩. তুমি যে ভাষায়ই কথা বলো না কেন, সব ভাষাতেই জবাব দিতে পারে সে কে ?
৪. কে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে বিশ্বের সব স্থানে ভ্রমণ করতে পারে।
৫. অল্প বয়সে লম্বা থাকলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটো হয়ে যায় কে ?
৬. একটি বল কীভাবে ছুঁড়লে আবার বলটি হাতে ফিরে আসবে ?
৭. তোমার কোন জিনিসটি অন্যেরা সবসময় ব্যবহার করে ?
৮. বহুদিন না ঘুমিয়ে একজন মানুষ কীভাবে বাঁচতে পারে ?
৯. উঁচু কিংবা নিচু যাই হোক না কেন, একটি নির্দিষ্ট জায়গাতেই কী থাকে ?
১০. কোন জিনিস কাটলে বড়ো হয় ?
১১. আল্লাহর কী কুদরত লাঠির ভিতর শরবত ?
১২. আমি যাকে মামা বলি বাবাও বলে তাই ছেলেও তাকে মামা বলে মাও বলে তাই।
১৩. কোন জিনিসের একটা মুখ আছে, দুটো হাত আছে কিন্তু কোনো পা নেই ?
১৪. তোমার টাকা দ্বিগুণ করার সহজ উপায় কী ?

উত্তরগুলো খুঁজে বের করো, না পারলে দেখো ৫৭ পৃষ্ঠায়

জরুরি ফোন নাম্বার

মনে রাখো, সাহায্য নাও

মেজবাউল হক

ছোট্ট বন্ধুরা, কোনো দুর্ঘটনা বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে পড়লে অনেক সময় আমরা কী করব ভেবে পাই না। কাকে জানাব, কোথায় ফোন করব, মাথা যেন কাজ করে না! এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধরেই মোকাবিলা করা প্রয়োজন। আর এখন প্রায় সবার কাছেই মোবাইল ফোন থাকে। তাই দ্রুত সহায়তা পেতে কিছু নাম্বারে ফোন করে সাহায্য নিতে পারো। তারা সব সময় তৈরিই থাকেন আমাদের সহায়তা করার জন্য।

১০৯৮
শিশু সহায়তামূলক কল সেন্টার। তোমার চারপাশে থাকা শিশুদের যে-কোনো সমস্যা হলে বিনামূল্যে কল করে এই নাম্বার থেকে সেবা পেতে পারো।

১০৯
নারী নির্যাতন বা বাল্যবিয়ে হতে দেখলেই বিনামূল্যে কল করো এই নম্বরে

১৬২৬৩
বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য কল সেন্টার। যে-কোনো সমস্যায় ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারো এখান থেকে।

৩৩৩
জাতীয় তথ্যবাতায়ন কল সেন্টার। বাংলাদেশের যে-কোনো তথ্য জানতে ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে কল করো এই নাম্বারে।

৯৯৯
বাংলাদেশের জরুরি কল সেন্টার। এখানে বিনামূল্যে ফোন করে তোমরা জরুরি মুহূর্তে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স এর সাহায্য নিতে পারবে। এছাড়াও যে-কোনো অপরাধের তথ্যও পুলিশকে জানাতে পারবে।

১৬৪৩০
সরকারি আইনি সহায়তা কল সেন্টার। আইনগত যে-কোনো পরামর্শ বা সাহায্য পেতে কল করো।

১৬১০৮
মানবাধিকার সহায়ক কল সেন্টার। কোথাও মানবাধিকার বিঘ্নিত হলে কল করো এই নাম্বারে।

১০৬
দুর্নীতি দমন কমিশনের কল সেন্টার। যে-কোনো দুর্নীতি চোখে পড়লে বিনামূল্যে কল করে জানিয়ে দাও।

১৬২৫৬
তোমার ইউনিয়নের সকল তথ্য জানতে কল করো ইউনিয়ন সহায়তামূলক কল সেন্টারে।

১৩১
বাংলাদেশ রেলওয়ে কল সেন্টার। ট্রেন ও টিকিট সম্পর্কে জানতে কল করো।

১০৫
জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্য কল সেন্টার

১৬১২৩
কৃষি, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ বিষয়ক যে-কোনো পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে কল করো এই নাম্বারে।

১০৯৪১
দুর্যোগ প্রারম্ভিক সতর্কতা কল সেন্টার।

rawpixel

বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরামর্শ

জান্নাতে রোজী

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় শান্তিপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের কিশোরী শিক্ষার্থীর মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরামর্শ এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়েছে। ২৫শে নভেম্বর উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরামর্শ দেন এবং ন্যাপকিন বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে ইউএনও রাহেলা রহমত উল্লাহ বলেন, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ বিষয়ে মেয়েরা কথা বলতে লজ্জা পায়। অভিভাবকেরাও এ বিষয় নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেন না, যা মোটেও ঠিক নয়। তিনি আরো বলেন, নিরাপদ স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার না করায় অনেক কিশোরীর জরায়ু ক্যানসার হয়ে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে বেশি পরিমাণে ফলমূল ও শাকসবজিসহ প্রচুর পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী কারিমা আক্তার বলেন, কিশোরীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বাজারে এই পণ্যের মূল্য বেশি। এই কর্মসূচিতে তারা উপকৃত হবে বলে সে জানায়। প্রশাসন সূত্র থেকে জানা যায়, এ উপজেলায় ৩৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা রয়েছে। সবগুলোতেই ১২-১৬ বছরের কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরামর্শ ও স্যানিটারি ন্যাপকীন ব্যবহার ইতোমধ্যে এ কার্যক্রমে বাস্তবায়ন হয়েছে।

ঢাবিতে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন চালু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে ও এসিআই কনজ্যুমার ব্র্যান্ডসের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি স্থানে ফ্রিডম হাইজিন কর্নার নামে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানো হয়েছে। এটি উদ্‌বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

মাসের নির্দিষ্ট সময়ে নারীদের ঋতুস্রাব প্রাকৃতিক নিয়মে হলেও সমাজে বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা হয় না। অনেক নারীই এ সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। দোকানে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে গেলে এখনো সংকোচ বোধ করেন। এই রাখঢাকের বিষয়টিকে সামনে নিয়েই চালু হলো স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন। এসব ভেন্ডিং মেশিন থেকে ১০ টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ন্যাপকিন সংগ্রহ করতে পারবেন। ■

ধাঁধার উত্তর

১. চিরনি, ২. ভুট্টা, ৩. প্রতিধ্বনি, ৪. ডাকটিকিট, ৫. মোমবাতি, ৬. ওপরের দিকে, ৭. নাম, ৮. রাতে ভালোভাবে ঘুমালেই হবে, ৯. রাস্তা বা পথ, ১০. পুকুর, ১১. ইক্ষু, ১২. চাঁদ মামা, ১৩. ঘড়ি, ১৪. আয়নার সামনের ধরো, তাহলেই দ্বিগুণ দেখাবে।

শিশুদের সকালের নাশতা

মো. জামাল উদ্দিন

ছোট্ট বন্ধুরা! তোমরা যারা স্কুলে যাও বা যারা এখনো স্কুলে যাওনি সবার জন্যই সকালের নাশতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারারাত না খেয়ে থাকার পর সকালের নাশতা হতে হবে স্বাস্থ্যকর ও পর্যাপ্ত।

শিশুর খাবার সেটা যে-কোনো বেলারই হোক, ছোটোবেলা থেকেই একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এক বছর বয়স থেকেই শিশুকে অল্প করে হলেও নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে শিশুর মুখ ধুয়ে দিয়ে প্রথমেই একটু পানি পান করাতে হবে। এরপর এক ঘণ্টার মধ্যে সকালের নাশতা শেষ করা ভালো। শিশুর বয়স অনুযায়ী সকালের নাশতার মেন্যু নির্বাচন করতে হবে। যেসব শিশু স্কুলে যায় তাদের নাশতার মেন্যু এক ধরনের। আবার এক থেকে চার বছর বয়সি শিশুদের নাশতা হবে ভিন্ন। এক বছর পর থেকে শিশুদের সারাদিনে ১ হাজার কিলোক্যালোরি প্রয়োজন হয়। প্রতি বছর এই চাহিদা ১০০ কিলোক্যালোরি করে বাড়তে থাকবে। সারাদিনের কিলোক্যালোরির ৪ ভাগের ১ ভাগ অথবা কিছু বেশি সকালের নাশতায় অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ এক বছর বয়সি শিশুর জন্য সকালের নাশতায় থাকা উচিত ২৫০-৩০০ কিলোক্যালোরি। এই চাহিদা পূরণে নাশতার মেন্যুতে থাকতে পারে ১টি ডিম, ১টি হাতে বানানো রুটি দিয়ে

সবজি রোল, ২৫০ মিলিলিটার দুধ ও ১টি ছোটো কলা। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর এবং মিড মর্নিং অর্থাৎ সকাল ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে আরেকবার খাবার দেওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন একই খাবার না দিয়ে নাশতায় বৈচিত্র্য রাখলে শিশুরা আগ্রহ নিয়ে খাবে। সেক্ষেত্রে রুটি-সবজির রোলের পরিবর্তে একদিন ডিম, দুধ, কলা -একদিন ডিম, আটা, চিনি ও দুধ দিয়ে বানানো প্যানকেক এবং কলা দেওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন সেদ্ধ ডিম না দিয়ে একদিন ডিম তেলে ভেজে দিতে পারেন। ডিম ভাজার সময় ওপরে একটু চিনি ছিটিয়ে দিলে সুন্দর বাদামি রং যোগ হবে আর খানিকটা গ্লুকোজও যোগ হবে। আবার হয়ত একদিন ডিম ও দুধ দিয়ে পুডিং হতে পারে।

স্কুলগামী শিশুদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাদের সকালের নাশতা দুই ভাগ করে এক ভাগ স্কুলে যাওয়ার আগে আরেক ভাগ টিফিনে দেওয়া যেতে পারে। স্কুলে যাওয়ার আগে ১টি ডিম, ব্রেড, মাখন, জেলি আর ১ গ্রাম দুধ খেতে পারে। ব্রেড আর ডিম দিয়ে টোস্ট তৈরি করলেও শিশুরা পছন্দ করে। টিফিনে থাকতে পারে ঘরে তৈরি সবজি-ডিম দিয়ে রান্না করা নুডুলস, প্যানকেক, কাবাব রোল, পনির ও কিমা সহযোগে স্যান্ডউইচ বা বার্গার ও ফলের জুস। নাশতায় অন্য যে-কোনো খাবারের পাশাপশি ১টি ডিম ও দুধ যেন অবশ্যই থাকে। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরাসরি ডিম খেতে না চাইলে ডিম দিয়ে তৈরি যে-কোনো খাবার খেতে দিন। মুরগি বা হাঁসের ডিমের পরিবর্তে কোয়েল পাখির ডিম থাকতে পারে। ডিমের পাশাপাশি সকালে ১ গ্লাস দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস করুন।

শিশুদের সকালের নাশতায় যেন তাজা খাবার থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে। কর্মজীবি মায়েদের তাড়া থাকলে রাতে নাশতা তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। তবে একদিনের বেশি ফ্রিজে থাকা খাবার শিশুদের খেতে দেওয়া যাবে না।

আরেকটি বিষয়, শিশুরা কোনোভাবেই যেন বাইরের কেনা অস্বাস্থ্যকর টিফিন না খায়, সেদিকে অভিভাবকদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ■

তাদের জন্য সব কবিতা

বাশার মাহফুজ

একাত্তরে রক্ত দিয়ে আনলো যারা জয়
পদ্মা-মেঘনা আজ অবধি তাদের কথা কয়।
কাঁচা রোদে ঝিলিক দেওয়া সোনা রবির হাসি
বউ কথা কও দোয়েল ঘুঘু বলে ভালোবাসি।

ফুল ফুটেছে হাজার হাজার মন মাতানো ঘ্রাণ
বিজয় মেখে উঠল নেচে বাংলাদেশের প্রাণ।
প্রজাপতি পাখায়-পাখায় আঁকলো নতুন ছবি
তাদের জন্য সব কবিতা লিখলো যেন কবি।

এই পতাকা সবুজ জমিন যাদের জন্য পাওয়া
তারাই আমার রাত্রি-দুপুর দীপ্ত ভোরের হাওয়া।
কলাপাতার দোদুল দোলা চিত্রা নদীর বাক
বুকের ভেতর একটা আকাশ লক্ষ পাখির ঝাঁক।

মুক্ত আকাশ মুক্ত হাওয়া পাখনা মেলা চিল
তাদের জন্য শুভ্র হাসি শাপলা ফোটা বিল।
শিল্পীমনে চিরটাকাল তাদের ছবি আঁকবে
এই মাটি আর গুল্মলতা সবাই মনে রাখবে।

ভালো রাজা ও খারাপ রাজা

কাজী সাইয়েদ আহমেদ

এক যে ছিল ভালো রাজা
যে দেয় না ভালোদেরকে সাজা,
আরেক ছিল খারাপ রাজা
যে দেয় না খারাপদেরকে সাজা।

ভালো রাজা দেয় না সাজা
কোনো ভালোদেরকে,
খারাপ রাজা দেয় না সাজা
কোনো খারাপদেরকে।

ভালো রাজার স্নেহ ও সম্মানে
মানুষ থাকে আনন্দেতে,
খারাপ রাজার ভয়ে মানুষ
থাকে ভীতু হয়ে।

চতুর্থ শ্রেণি, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

মুবাশশির আহমেদ কাদির, সপ্তম শ্রেণি, স্কলারস স্কুল এন্ড কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা

মাহির ওয়াইজ মিয়েল, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

দশদিগন্ত

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কেক-এ বাংলাদেশ!

কেক-এ বাংলাদেশ! হ্যাঁ বন্ধুরা, কেক-এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যগুলো। এই কেক আর্টিস্ট বাংলাদেশের তাসনুভা আলম। যুক্তরাজ্যের আবেরডিন শহরে তাসনুভার কেকের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কেক আর্টিস্টরাও এখন বাংলাদেশকে চিনেন। তাসনুভা আলম কেক ইন্টারন্যাশনাল থেকে কেক-এর জন্য প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিনবার স্বর্ণপদক পেয়েছেন। এই কেক-এর মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশকে তুলে ধরেছেন বিশ্বদরবারে। বাংলাদেশকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। 'ম্যাগনিফিসেন্ট বাংলাদেশ ইন্টরন্যাশনাল কেক কলাবোরেশন'-এর উদ্যোক্তা তাসনুভা। তিনি জানান, কেক কোলাবোরেশনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা। এতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ২৬টি দেশের ৭৭টি কেক স্থান পেয়েছে। তিনি নিজেসহ ১৭জন বাংলাদেশি অংশ নেন। তাসনুভা নিজে কোলাবরেশনে কেক-এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবয়ব তুলে ধরেন। এছাড়া তৈরি করেন পান-সুপারি অবয়বের কেকও। পাশাপাশি ছিল বিদেশি কেক আর্টিস্টদের আঁকা স্মৃতিসৌধ, শাপলা, দোয়েল, শহিদমিনার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেহেদি ডিজাইন, ইলিশ মাছ, মসজিদ প্রভৃতি।

বরফের ডিম!

ফিনল্যান্ডের উপকূল বরাবর ডিমের আকৃতির মতো হাজার হাজার বরফপিণ্ড তৈরি হয়েছে। ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের মাঝে হাইলোটো নামের একটি দ্বীপে বরফের ডিমে আবৃত সৈকতটি দেখা গিয়েছে। অপূর্ব দৃশ্যটি দেখেছেন শখের ফটোগ্রাফার রিসতো মাতিলা। বিরল এক আবহাওয়ায় বাতাস এবং পানির ধাক্কায় বরফের কুচিগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে মিশে ডিমের আকার ধারণ করেছে। সেদিন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে ছিল। রোদ ছিল। জোরে বাতাস বইছিল। তারমধ্যে এই অসাধারণ দৃশ্যটি চোখে পড়ল ফটোগ্রাফারের। প্রায় একশ ফুট জুড়ে হাজার হাজার বরফের ডিম পড়েছিল। ছোটো ছোটো বরফগুলো দেখতে ডিমের মতো আর বড়োগুলো ফুটবলের মতো।

চা ছাড়া ঘোড়ার ঘুম ভাঙে না

সকালবেলা এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চা-মানেই ফুরফুরে একটি দিনের শুরু। এমন অভ্যাস আমাদের অনেকের-ই আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো একটি ঘোড়ারও মানুষের মতো এমন অভ্যাস আছে। এ ঘোড়া কিন্তু যেনতেন ঘোড়া নয়; একেবারে পুলিশের ঘোড়া। সকালবেলা এক কাপ চা না পেলে নাকি ঘোড়ার দিনই শুরু হয় না। ব্রিটেনের মারসিসাইড এলাকার পুলিশের এই ঘোড়াটির নাম জেক। গত ১৫ বছর ধরে সে পুলিশের সাথে রয়েছে। এতগুলো বছর ধরেই তার এই চা-এর অভ্যাস রয়ে গেছে। মারসিসাইড পুলিশের মাউন্টেড বিভাগে রয়েছে মোট ১২টি ঘোড়া। তাদের মধ্যে জেকেরই এই অদ্ভুত স্বভাব। সকালে জেক তার আস্তাবলেই চায়ের জন্য অপেক্ষা করে। সেখানেই এক মগ চায়ে দু'চামচ চিনি, ক্রিম ছাড়া দুধ আর গরম জলের সঙ্গে মেশানো হয় ঠান্ডা জল। কারণ ফুটন্ত চা খেতে মোটেও পছন্দ করে না জেক। বেশ আয়েশ করেই চা দিয়ে তার দিন শুরু হয়। জেকের চা খাওয়ার ভিডিও পুলিশের তরফ থেকে টুইটারে শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'সকালবেলা এক কাপ গরম চা না পেলে বিছানাই ছাড়তে চায় না জেক। তবে একবার চা খেয়ে নিলেই টগবগে হয়ে দিন শুরু করে দেয় ও।'

ইঁদুর-হরিণ

দেখতে অনেকটা হরিণের মতো। কিন্তু ঠিক হরিণ নয়। খরগোশের আকারের প্রাণীটি কিছুটা ইঁদুরের মতোও। ছোট্ট এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে তাই ডাকা হয় 'ইঁদুর-হরিণ'। ১৯৯০ সালে ভিয়েতনামের উত্তর-পশ্চিম দিকের বনাঞ্চলে এই প্রাণীটি দেখা যায়। এরপর দীর্ঘ ৩০ বছরেও এই প্রাণীটির দেখা মেলেনি। সম্প্রতি ৩০ বছর পর প্রাণিবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে ভিয়েতনামের জঙ্গলে এই ইঁদুর হরিণের আবারো দেখা পাওয়া গেছে। সমান পদতলবিশিষ্ট প্রাণিগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম 'ট্রাগুলুস ভারসিকালার'। 'ন্যাচার ইকোলজি অ্যান্ড ইভলিউশন'-এ এই প্রাণীটিকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে প্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটি একটি রূপালি পিঠের 'শেভ্রোটাইন', বা 'মাউস ডিয়ার' (ইঁদুর-হরিণ)। হরিণটা কিছুটা ইঁদুরের মতো দেখতে বলে এর নামকরণটি এমন।

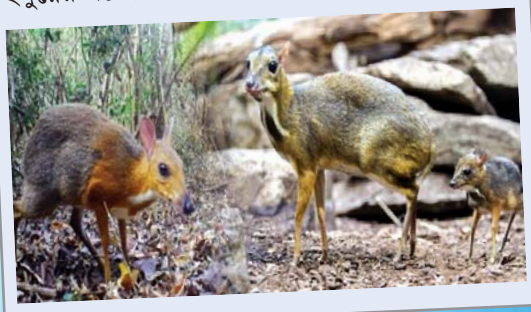

সাদিয়া তাসনিম মোহনা, সপ্তম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

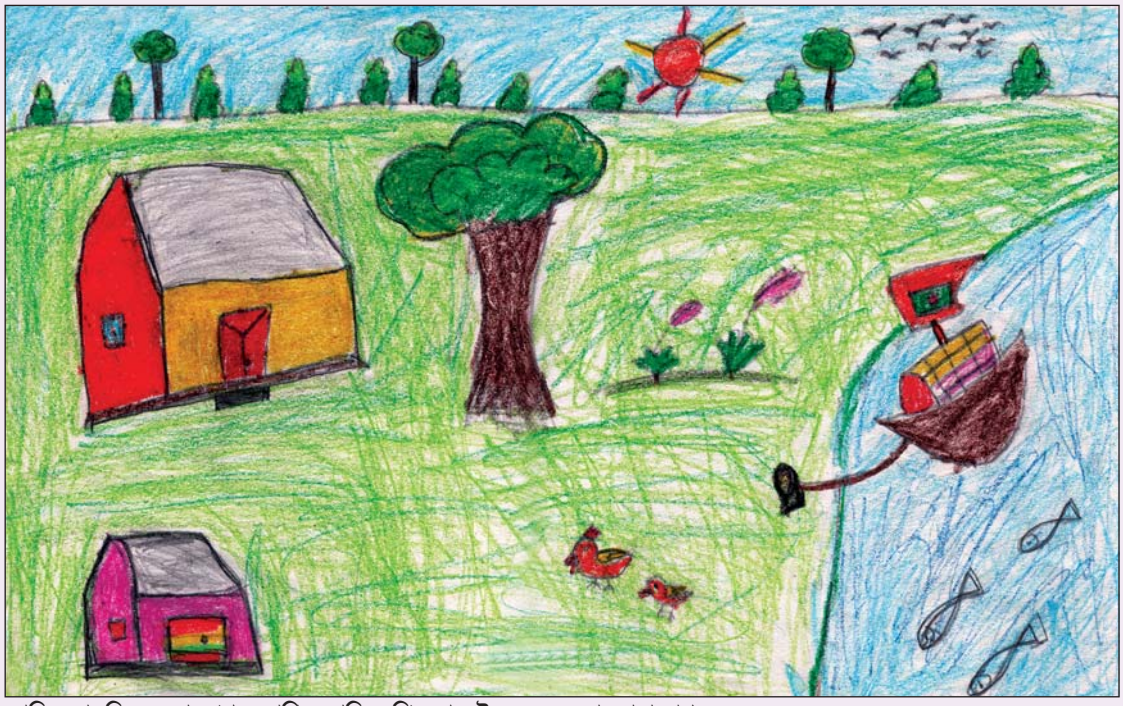

জারিন তাসনিম জেবা, প্রথম শ্রেণি, ক্যালিক্স প্রি-ক্যাডেট স্কুল, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি: ১. বিমান, ৫. এক প্রকার টক-মিষ্টি ফল, ৬. কূল, ১০. অনুমান, ৭.বিষ্ঠা, ১১. হাতের একটি আঙুলের নাম, ১২. মাছ ধরার সরঞ্জাম বিশেষ

উপর-নিচ: ১. উড়তে পারে এমন এক ধরনের মাছ, ২. মুঘল সাম্রাজ্যের চতুর্থ সম্রাট, ৩.জলে চরে এক ধরনের জন্তু, ৪.লিখতে অক্ষম এমন কোনো ব্যক্তি, ৬.তীর নিক্ষেপকারী, ৮. লতা, ৯. এক ধরনের খেলা

১		২		৩		৪	
				৫			
	৬					৭	৮
					৯		
১০				১১			
					১২		

উত্তর

উ	ড়ো	জা	হা	জ		ব	
ডু		হা		ল	ট	ক	ন
ক্কু		ঙ্গী		চ		ল	
	তী	র		র		ম	ল
	র				কা		তি
আ	ন্দা	জ		অ	না	মি	কা
	জ				মা		
					ছি	প	

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৭	*		-	৮	=	
-		+		/		+
	+	৩	-		=	৫
/		-		+		-
১	+		-	৩	=	
=		=		=		=
	-	১	+		=	৯

সমাধান

৭	*	২	-	৮	=	৬
-		+		/		+
৪	+	৩	-	২	=	৫
/		-		+		-
১	+	৪	-	৩	=	২
=		=		=		=
৩	-	১	+	৭	=	৯

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে-সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: অশীতিপর, ফরিদপুর, ছল, নতুন, বিবাদমান, বিরতিহীন, নবীনগর, নবাব, বছর

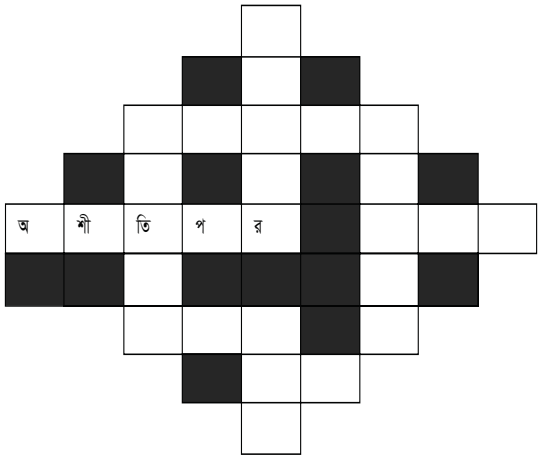

গত সংখ্যার সমাধান:

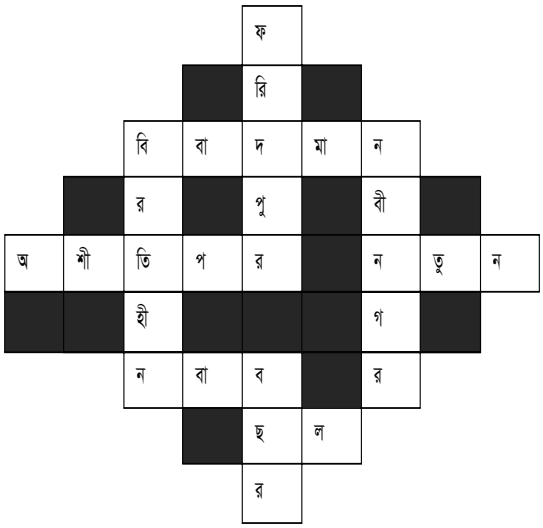

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপর-নিচ আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৪৫		৪৩	৩০			২৭		২৩
	৪৭			৩৪			২৫	
৪৯			৩২		৩৬	১৭		
	৫১	৪০		৩৮			১৯	
৫৩		৭৩			৭০	১৫		১১
	৮১		৭৫	৬৮			১৩	
		৭৭			৬৬	৭		৯
	৭৯			৬২			৩	
৫৭			৬০		৬৪	৫		১

সমাধান

৪৫	৪৪	৪৩	৩০	২৯	২৮	২৭	২৪	২৩
৪৬	৪৭	৪২	৩১	৩৪	৩৫	২৬	২৫	২২
৪৯	৪৮	৪১	৩২	৩৩	৩৬	১৭	১৮	২১
৫০	৫১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	১৬	১৯	২০
৫৩	৫২	৭৩	৭২	৭১	৭০	১৫	১২	১১
৫৪	৮১	৭৪	৭৫	৬৮	৬৯	১৪	১৩	১০
৫৫	৮০	৭৭	৭৬	৬৭	৬৬	৭	৮	৯
৫৬	৭৯	৭৮	৬১	৬২	৬৫	৬	৩	২
৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬৩	৬৪	৫	৪	১

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-5, November 2019, Tk-20.00

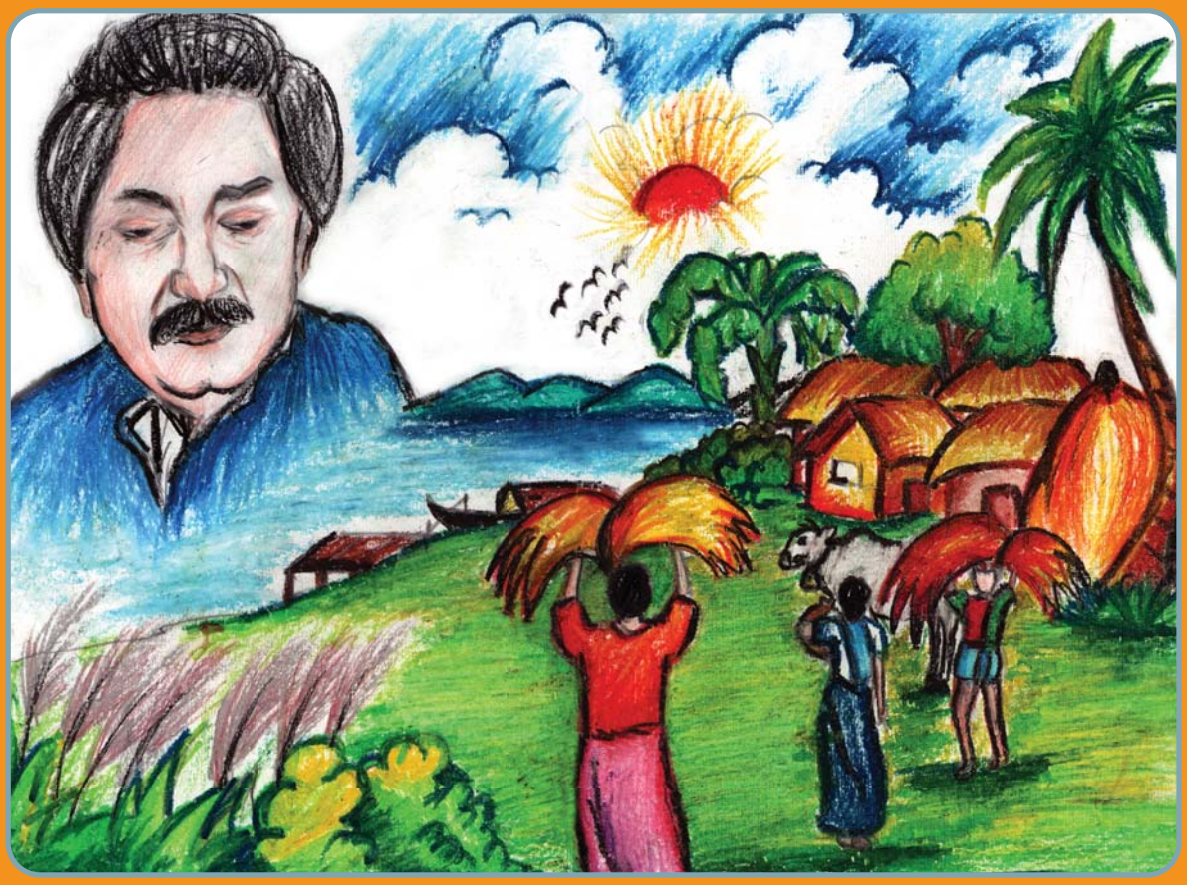

লিলিয়ান ত্রিপুরা, ষষ্ঠ শ্রেণি, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, কক্সবাজার

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা